ওতম্

ত্রৈতবাদ

[ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি; এই অনাদি সত্তাত্রয়ের পরিচিতি ও অস্তিত্বের প্রমাণ সহ বিবিধ আলোচনা]

আশীষ সরকার



ওতম্

ত্রৈতবাদ

[ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি; এই অনাদি সত্তাত্রয়েরর পরিচিতি ও অস্তিত্বের প্রমাণ সহ বিবিধ আলোচনা]

লেখক—আশীষ সরকার

ওতম্

ত্রৈতবাদ

[ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি; এই অনাদি সত্তাত্রয়ের পরিচিতি ও অস্তিত্বের প্রমাণ সহ বিবিধ আলোচনা]

লেখক—আশীষ সরকার

প্রচ্ছদ—সৈকত চন্দ্র বীর

প্রথম প্রকাশ—২০ জানুয়ারী, ২০২৪

উ ৎ স র্গ:

বাংলাদেশ অগ্নিবীর’কে।
যাঁরা আমাকে জ্যোতির পথ দেখিয়েছে।
যাঁদের কারণে এই অধমের ঈশ্বর চিন্তনে সুমতি হয়েছে।

যখন পথ হারিয়েছিলাম,
তুমিই অগ্নিবীর ক্রোড়ে তুলে নিয়েছিলে।
ভয়ে যখন আমি সমাচ্ছন্ন,
তুমিই অগ্নিবীর অভয় প্রদান করেছিলে।
তোমার অভয়েই আজ সত্যকে চিনেছি,
মত-পথের ভ্রান্তি থেকে নিষ্কলুষ হয়েছি॥

ভূমিকা

ঈশ্বর আছে, নাকি নেই? আত্মা বলে শরীর মধ্যে কোন সত্তা আছে কি-না? এই জগৎ কোথা থেকে এসেছে? দৃশ্যমান সব বস্তুরই উপাদান থাকে, তবে এই জগতের উপাদান কী?—এই প্রশ্নগুলো নতুন নয়, দীর্ঘদিনের। ঋষি-মহর্ষিগণ ধ্যানমগ্ন হয়ে খুঁজেছেন এর উত্তর, রচনা করেছেন মূল্যবান সব গ্রন্থাদি। যা আজও সনাতনীগণ হৃদয়ে ধারণ করেন। উপলব্ধি করেন মহর্ষিগণের জ্ঞানের বিশালতা।

ঈশ্বর নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান নীরব। এই সত্তাগুলো আছে, না কি নেই, বিজ্ঞানের কোন স্পষ্ট উত্তর নেই এব্যাপারে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার যেমন, প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের নিরবচ্ছিন্নতার সম্পর্ক, পৃথিবীর বুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণের উদ্ভব এবং পরীক্ষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নতুন জীবন সৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়, মহাশূন্যে মানুষের অভিযান, অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা, মানুষের বংশগতির বাহক জিনের নিয়ন্ত্রণ, পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে মারণাস্ত্র তৈরি করে তার দ্বারা মানুষের আত্ম-হনন, এসব ঘটনা এবং সম্ভাবনা, যার ভাল মন্দ উভয় ধরনের পরিণাম রয়েছে, সবই এক প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক। এই প্রাকৃতিক অবস্থার রয়েছে এক স্বয়ংক্রিয়া গঠন। ঈশ্বর এই প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, যা হল একটি পরিবেশ,—যেখানে মানুষ স্বাধীন এবং দায়ীত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে প্রভাবের কথা বলা যেতে পারে তা হল, এটি কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আওতার পড়ে না। বিজ্ঞান বিষয়টি স্বীকার করতেও পারে না বা অস্বীকারও করতে পারে না। এজন্যই বিজ্ঞান এই বিষয়ে নীরব থাকে।

সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি অপ্রমাণ করাও যায় না। অনেক বিজ্ঞানী স্বীকার করেন, অনেকে করেন না।

শূন্য থেকে কোনকিছু উৎপন্ন হতে পারে না, এর একটা উপাদান লাগবেই। আপনার সামনে থাকা মোবাইল, কম্পিউটার বা বইয়ের কথাই ধরুন, এদের

একটা উপাদান কারণ আছে। এবং যেটা এদের উপাদান, সেই পদার্থেরও উপাদান আছে। এভাবে উপাদান কারণ খুঁজতে খুঁজতে অন্তিমে গেলে পাব মূল প্রকৃতি, যেটা সম্পূর্ণ জগতের উপাদান কারণ। এই যে আপনার-আমার শরীর, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, পাহাড়-পর্বত বা চক্ষু দ্বারা দৃশ্যমান সকল বস্তুর উপাদান কারণও এই প্রকৃতি।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, এক অতি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে এই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং সেটা প্রতি মূহুর্তেই বেড়েই চলেছে। এমন একটা সময় সময় আসবে যখন আবার এই মহাবিশ্ব সঙ্কোচন হতে হতে সেই ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হবে। একেই ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি ও লয় বলে। এই সৃষ্টি-লয় শুধু যে প্রথমবার হয়েছে তা নয়, পূর্বে অসংখ্যবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। অসংখ্যবার বলতে আসলে কী বুঝায়? সংখ্যায় কতবার? অসংখ্যবার বলতে গণনা করা যায় না, এমনটাই বুঝানো হচ্ছে। কারণ, যদি গননা করা যায় এমন সংখ্যা বুঝানো হয়, তবে তারও পূর্বের সৃষ্টির কথা আসবে; এভাবে পূর্বের সৃষ্টিতে যেতে থাকলে প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে তো জানাই যাবে না, বরং বিশাল এক গোলযোগের মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং এই সৃষ্টি-লয় প্রক্রিয়া অনাদি, এর শুরু ও শেষ নেই। না, আমি বিজ্ঞানের আলোকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আলোচনা করি নি। তবে এটুকু বলতে পারি, বিজ্ঞানের বিরূদ্ধে যায় এমন কিছুও লিখি নি।

কোনকিছু কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হতে পারে? আপনার হাতে থাকা মোবাইল, কম্পিউটার বা বইয়ের কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হওয়া সম্ভব? একটি দালান কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হতে পারবে? উত্তর—না। কোনকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হতে পারে না, একজন সচেতন সত্তা লাগবেই, যিনি এগুলো তৈরি করবেন। তেমনি এই মহাবিশ্বও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় নি, সচেতন ঈশ্বর এই কার্য সম্পাদন করেছেন। তবে কি ঈশ্বর সাকার? যদি নিরাকার হন, তবে নিরাকারের দ্বারা সাকার সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব? আর তিনি কেনই বা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন? এতে তাঁর কোন লাভ আছে কি-না? উত্তর—ঈশ্বর নিরাকার। সৃষ্টিতে তিনি নিমিত্ত কারণ, সৃষ্টির জন্যে তাঁর সাকার হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। হস্তপদহীন হওয়া স্বত্বেও তাঁর ইচ্ছামাত্রই সকল কার্য সম্পাদিত হয়। নিমিত্ত কারণ বলতে কী

বুঝায় ও তিনি কেন তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন—এগুলোর উত্তর গ্রন্থমধ্যে আছে, এজন্য এখানে আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। তবে এস্থলে ত্রৈতবাদ নিয়ে সাধারণ বিষয়গুলোর অবতরণ আমি আবশ্যক বলে মনে করি।

ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি; এই তিনটি অনাদিতত্ত্ব। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান ও চেতন। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, চেতন, সীমাবদ্ধ ও আয়তনে অণু পরিমাণ। প্রকৃতি অচেতন, জ্ঞানরহিত, জড় ও পরিণামী। প্রকৃতি ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতিরেকে সঞ্চালিত হতে পারে না। ঈশ্বর এই প্রকৃতি দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির গুণানুযায়ীই এই সমস্ত সৃষ্টি। কারণ উপাদানের গুণ অনুসারেই কার্য দ্রব্যে গুণ জন্মে। অতএব কার্যের গুণ দেখে কারণের গুণ কল্পনা করা যেতে পারে। কার্যে আমরা জ্ঞান, অজ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রবৃত্তি, মোহ প্রভৃতি অনেক গুণ ক্রিয়া দেখতে পাই, তদনুসারে মূলকারণেও এসকল গুণ অবশ্যই স্বীকার করা আবশ্যক। সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি।

সত্ত্বের ধর্ম জ্ঞান, সুখ ইত্যাদি; রজের ধর্ম দুঃখ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি; তমের ধর্ম মোহ, আবরণ ইত্যাদি। এই তিনদিকে গুণ বলার কারণ কি? গুণ বলতে ধর্মকে বুঝায়, সুতরাং প্রকৃতির তিনটি ধর্ম বলাও অযৌক্তিক নয়। এই তিনটি মিলে ত্রিগুণ রচিত দঁড়ির ন্যায় কাজ করে বলে এদেরকে গুণ বলে। এই গুণত্রয় থেকে প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ গুণত্রয় প্রকৃতির অবয়ব, ব্যাপারটা এমন নয়, কিন্তু গুণত্রয়ই প্রকৃতি।

এরা চিরকাল মিলিত, সংযোগ-বিয়োগ রহিত, নিত্য সহচর, একে অপরের আশ্রয়, পরস্পর পরিণামের কারণ। অবয়বের বিভাগ হতে হতে যখন আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না, সেটিই মূলকারণ প্রকৃতি। অসতের উৎপত্তি হয় না, সতের বিনাশ হয় না, একীভূত অবস্থায় কার্যগুলো প্রলয়কালে প্রকৃতিতে থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়। এজন্য জগদুৎপত্তির নাম আবির্ভাব ও বিনাশের নাম তিরোভাব। সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়ের পর প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তার নাম ‘প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থা’ এবং সৃষ্টির সময় থেকে প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতি যে অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তার নাম ‘প্রকৃতির স্থূলাবস্থা’।

ঈশ্বরের সঞ্চালনায় প্রকৃতি থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর পূর্বকল্পের কর্মানুযায়ী জীবাত্মাকে যোগ্য যোনিতে জন্ম প্রদান করেন এবং জীবের ভোগের নিমিত্ত এই প্রকৃতিকে ভোগ্য করেন, আর জীবাত্মাকে ভোক্তা। প্রলয়কালে প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যভাবে থাকে, একে অপরকে অভিভব করে না। সুখ-দুঃখ-মোহ স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর বিরোধ পরিহার করে মিত্রের ন্যায় অবস্থান করে। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবাত্মার সংযোগে গুণত্রয়ের আর মিত্রভাব থাকে না। তখন তারা একে অপরকে অভিভব করে। এভাবেই গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হয়। বৈষম্য যে একরূপ হবে, এর কোন নির্দিষ্টতা নেই, অনেক রকম হতে পারে, আর এজন্যই সৃষ্টিতে বিভিন্নতা দেখা যায়।

প্রকৃতির ত্রিগুণ যখন জীবাত্মাতে আরোপিত হয়, তখন জীবাত্মার আর নির্মল স্বচ্ছভাব থাকে না, সেই পবিত্র সত্তা তখন সংসারের কীটরূপে পরিণত হয়। তবে আত্মজ্ঞানের দ্বারা জ্যোতির্ময় প্রভুর রূপ যখন অন্তরে প্রকাশিত হয়, একমাত্র তখনই জীবাত্মার উদ্ধার হয়,—এটিই মোক্ষাবস্থা। স্থূলশরীর থেকে সূক্ষ্মশরীরে গমন হওয়াকে মৃত্যু ও সূক্ষ্মশরীর থেকে স্থূলশরীরে গমন করার নাম জন্ম। আমাদের মনে রাখতে হবে,—জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু হয় না; শুধুমাত্র গতাগতি বা স্থূলশরীর পরিবর্তন হয়, যেভাবে মানুষ পুরাতন বস্ত্রের পরিবর্তন করে।

স্থূলশরীরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে জীবাত্মা সুখ, দুঃখ, মোহাদির অনুভব করে থাকে। লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ নাশ হলে জীবাত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন আর জীবাত্মাতে সুখ, দুঃখ, মোহাদির আরোপ হয় না। জীবাত্মার এই অবস্থাকেই মুক্তি বলে।

বৈদিক শাস্ত্রে ত্রৈতবাদই উদ্দিষ্ট হয়েছে। ত্রৈতবাদ ছাড়া সনাতনধর্ম খঞ্জ। এই গ্রন্থে বেদাদি সত্য শাস্ত্রসমূহ থেকে ত্রৈতবাদ প্রমাণসহ দেখান হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পাঠকের যেন বুঝতে অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য সত্তাত্রয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং স্থলে স্থলে সত্তাত্রয়ের সম্বন্ধযুক্ত আলোচনারও অবতরণ উপস্থিত আছে।

এই গ্রন্থ আমার মৌলিক নয়। আমি মালীর ন্যায়; বিভিন্ন বৃক্ষ থেকে ফুল সংগ্রহ করে গ্রথিত করেছি মাত্র। **গ্রন্থঋণ** অংশে তাঁদের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে যদি কোনপ্রকার দোষত্রুটি থেকে থাকে তার সম্পুর্ণই আমার, গুণগুলো তাঁদের। আমি অধম, এর অধিক কিছু করার সামর্থ আছেই বা-কি! যদি কেউ এই গ্রন্থ পড়ে উপকার লাভ করেন তবেই আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সফল মনে করব। যতটুকু পেরেছি গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য হয়েছি পাঠক বিবেচনা করবেন।

নমস্কার।

—আশীষ সরকার

১৫ই জানুয়ারী, ২০২৪

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর

কোন পদার্থ নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করতে হলে সৃষ্টির পূর্বেই তার অস্তিত্ব প্রয়োজন। শূন্য থেকেও কোনকিছু উৎপন্ন হতে পারে না। কোন বিষয়ের উৎপত্তি বলতে আমরা চারটি কারণের একটি বুঝে থাকি। যথা—(১) এটি কোন বৃহত্তর পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, (২) এটি কোন সমান পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, (৩) এটি কোন ক্ষুদ্রতর পদার্থ থেকে উৎপন্ন বা পূর্ণতা লাভ করেছে, এবং (৪) ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়েছে। যিনি অনন্ত, তাঁর সম্বন্ধে প্রথম কারণ সম্ভব নয়, কারণ অনন্ত অপেক্ষা বৃহত্তর কিছুই নেই। দ্বিতীয় কারণও সম্ভব নয়, কারণ দুই অনন্ত সত্তা অসম্ভব, এবং যদি পূর্বের অনন্ত সত্তা পরিবর্ধিত হয়ে দ্বিতীয় অনন্ত সত্তা উৎপন্ন হয়, তা হলে পূর্ব ও পরের স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না।

তৃতীয় কারণও সম্ভব নয়, কারণ ক্ষুদ্রতর পদার্থ থেকে বৃহত্তর পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে দু'টি প্রণালীতে; প্রথমতঃ, বৃহত্তর পদার্থ অন্ততঃ আদর্শরূপে ক্ষুদ্রতর পদার্থের মধ্যে বর্তমান থাকবে, যেমন বীজে পূর্ণ বৃক্ষের আদর্শ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্রতর পদার্থ বৃহত্তর হওয়ার জন্য অন্য কোন স্থান থেকে শক্তি সংগ্রহ করবে। অনন্ত সত্তা যদি ক্ষুদ্র পদার্থ থেকে উৎপন্ন বা বিকাশপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করা যায়, তা হলে স্বীকার করতে হবে ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে অনন্ত সত্তার আদর্শ রয়েছে। আদর্শ অর্থই জ্ঞানময় রূপ, যা আত্মা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। অনন্ত আদর্শ অনন্ত পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত তাঁরই জ্ঞানময় রূপ। ক্ষুদ্র থেকে অনন্তের উৎপত্তির পূর্বেই অনন্ত পরমাত্মা বর্তমান রয়েছেন, অতএব উৎপত্তির কথা ব্যর্থ। দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোন স্থান থেকে অনন্ত উপাদান সংগ্রহ করতে হলে পূর্বেই অপর অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

চতুর্থতঃ, উৎপত্তির কারণ ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমন্বয়। কিন্তু ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমন্বয়ে অনন্ত সত্তার একত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অনন্ত ক্ষুদ্রবস্তু সমূহকে একত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আরও একটি অনন্ত সত্তার প্রয়োজন হয়, কিন্তু দুই

অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব। অধিকন্তু ক্ষুদ্র বস্তু থেকে অনন্তের উৎপত্তি স্বীকার করলে ক্ষুদ্র বস্তু সমূহের সকলকেই অনাদি বলে স্বীকার করতে হয়, এটিও সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র বস্তুরই উৎপত্তি আছে, অনন্ত সত্তা সম্বন্ধে উৎপত্তির কোন প্রশ্নই আসে না।

তার যেমন উৎপত্তি নেই, সেরূপ তার বিনাশও নেই, কারণ অনন্ত অনিঃশেষিত, এর কখনও কোন অবস্থাতেই শেষ হতে পারে না। অনন্তকাল ধরে বর্তমান থাকলেও তার শেষ নেই। অনন্ত কর্মপ্রবাহেও তার অনন্ত শক্তির শেষ হয় না। তিনি অপেক্ষা কোন বৃহত্তর পদার্থ নেই যা তাকে বিনাশ করতে পারে।

পঞ্চমতঃ, যাঁর কোন অভাব নেই, তাঁর কোন দুঃখ থাকতে পারে না। অনন্ত সত্তার কোন অভাব নেই, অতএব তাঁর দুঃখও নেই। ষষ্ঠতঃ, সৌন্দর্যের অভাব বিশৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরিক বিরোধ। অনন্ত পরমাত্মার মধ্যে তা থাকতে পারে না।

অতএব যে অনন্ত সত্তা আমরা ধারণা করতে পারি, তা সর্বতোমুখী সত্তা, এক ও অদ্বিতীয়, জন্ম-মৃত্যু রহিত, পূর্ণ জ্ঞানময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় ও সুন্দর। অজ্ঞান, অসত্য, অপ্রেম, পাপ, অমঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের অভাব তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও থাকতে পারে না।

সপ্তমতঃ, তিনি অজ্ঞানী হতে পারেন না, কারণ অনন্ত আত্মার স্বরূপ অনন্ত জ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞান শব্দে আমরা মিথ্যা জ্ঞানকেও বুঝি। যা সত্য তাকে অসত্য হিসেবে জানা এবং যা অসত্য তাকে সত্য হিসেবে জানা—এটিই অজ্ঞান। অনন্ত আত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞান কল্পনা করলে তাঁর মধ্যে ভ্রান্তি স্বীকার করতে হয়, কারণ যা আছে তার সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান নেই এবং যা নেই তাকে সত্য বলে জ্ঞান করা হচ্ছে। এতে আত্মার একত্ব ও জ্ঞানের অনন্তত্ব থাকে না।

ঈশ্বরের স্বরূপ

এই জগতে তিনটি অনাদি সত্তা রয়েছে—(১) প্রকৃতি (২) জীবাত্মা এবং (৩) পরমাত্মা (ঈশ্বর)। এই তিনটি অনাদি সত্তার প্রথমটি ভোগ্য, দ্বিতীয়টি ভোক্তা এবং তৃতীয়টি অভোক্তা। অর্থাৎ অনাদি প্রকৃতিকে অনাদি জীবাত্মা ভোগ করে, কিন্তু

অনাদি পরমাত্মা জীব দ্বারা ভুক্ত প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ তিনি এই প্রকৃতিতে লিপ্তও হন না ভোগও করেন না।

পরমাত্মা জগতের স্রষ্টা ও রক্ষক। "তিনি (ঈশ্বর) সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, শরীররহিত, ছিদ্ররহিত, স্নায়ু আদির বন্ধন রহিত, রোগরহিত, জন্মরহিত, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, দুষ্টের দমনকর্তা ও অনাদি।"[1]

জীবাত্মার ভোগের নিমিত্তই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সহজভাবে বললে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুগম করতেই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। ঈশ্বর এই সত্তাকে সৃষ্টি করেন নি (পূর্বেই বলেছি প্রকৃতি অনাদি)। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের ন্যায় এদেরও অস্থিত্ব ছিল, জগৎ ধ্বংসের পরও এদের অস্তিত্ব থাকবে। সুতরাং ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নয়, নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকারূপ উপাদানের সাহায্যে ঘট নির্মাণ করেন, ঈশ্বরও তেমনি উপাদান কারণ প্রকৃতির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অসীম ও নিত্য। তাঁর সৃষ্ট জগৎ তাঁকে সীমিত করতে পারে না। জগৎ তাঁর দেহ, আর তিনি জগতের আত্মা। আত্মার সঙ্গে জীবদেহের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও সেই সম্বন্ধ। আর ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক হল পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। পিতা যেরূপ পুত্রের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে পুত্রকে কর্মে নিযুক্ত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে তার অতীতের কর্মানুসারে বর্তমান কর্মে নিযুক্ত করেন। ঈশ্বর জীবের কর্মফলদাতা। জীব নিজের ইচ্ছায় কর্ম করে বটে, কিন্তু কর্মফল তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ঈশ্বরই জীবের কর্মের গুণাগুণ বিচার করে কর্মের গুণানুসারে ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। জীব কর্মানুযায়ী পাপ-পুণ্যের অধিকারী হন এবং এই পাপ-পুণ্য যেখানে সঞ্চিত থাকে তার নাম অদৃষ্ট। ঈশ্বরই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ, অদৃষ্ট অচেতন, তাই অদৃষ্টস্থিত কর্মফল জীবের ভোগার্থে প্রদানের জন্য একটি সচেতন সত্তার প্রয়োজন। সেই সচেতন সত্তাই ঈশ্বর।

[1] স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়ম ব্রণম স্নাবিরম শুদ্ধ মপাপ বিদ্ধম।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা তথ্যতোহর্থাম্ব্যদধাচ্ছা শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥—যজুর্বেদ ৪০।৮

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ

পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট বলেন—"মানুষের নৈতিক চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে সমর্থন করে। নৈতিক যুক্তি দেখাতে চায় যে মানুষের নৈতিক অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। যেভাবে যুক্তিটি উপস্থাপিত হয়েছে তা নিম্নরূপ—

নৈতিক মূল্য বস্তুগত এই অর্থে যে তারা মানবপ্রকৃতির প্রয়োজনীয় গুণ। সুতরাং মানবপ্রকৃতি যেন এই জগতের একটা বাস্তব অংশ। মানুষ মনে করে সে এবং তার মূল্যগুলো বাস্তব এবং সেহেতু এই বিশ্বজগৎ একটি নৈতিক বিশ্বজগৎ। প্রয়োজন, কামনা, বাসনা, স্বার্থ, মানুষের প্রকৃতি বা সমাজের গঠনের সাহায্যে নৈতিক মূল্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বা অন্য কোন ভাবেও তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, যদি না সেই ব্যাখ্যাকে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করা না হয়। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যের অপ্রাকৃতিক ভিন্ন কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই বিশ্বজগতে মানুষ এবং মঙ্গলের আদর্শের স্থান আছে, যা নৈতিক মূল্য বাস্তব মানুষের প্রকৃতির একটা মৌলিক গুণ। কিন্তু এই বিষয়টি স্বীকার করে নিলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে এক চেতন বৌদ্ধিক সত্তার অস্তিত্ব আছে, যিনি নৈতিক জীব হিসেবে মানুষের নৈতিক চেতনাকে বিকশিত করেন। এই অতিমানবীয় শক্তি অবশ্যই চেতন এবং বৌদ্ধিক হবে, যিনি উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করেন এবং সেগুলোকে সিদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। সংক্ষেপে তিনি হবেন একজন পুরুষ। এই পুরুষই হলেন ঈশ্বর।" তাই নৈতিক মূল্যকে বস্তুগত গণ্য করলে অবশ্যম্ভাবীভাবে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং নৈতিক বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

এই নৈতিক বিশ্বজগতে মানুষের অবশ্যই কর্তব্য সম্পাদনের স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনের স্বাধীনতা থাকলেও মানুষের পক্ষে এই জীবনেই তার সব কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। নৈতিক বাধ্যতা বোধের সব দাবিকে এই জীবনে পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এই জীবনের পরেও একটা ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা, ঈশ্বর ছাড়া আমাদের এই কর্তব্যের চেতনা বা পরমকল্যাণকে লাভ করা যে আমাদের কর্তব্য, তা যে নিছক ভ্রান্তি নয়—এই সুনিশ্চিত আশ্বাস লাভ করা যাবে কার কাছ থেকে? কর্তব্য

সম্পাদনের জন্য মানুষের প্রয়োজন অনন্ত জীবন এবং ঐশ্বরিক সমর্থনের আশ্বাস। মানুষ যদি তার পরমকল্যাণকে লাভ করতে না পারে, তাহলে নৈতিক জীবন হয়ে পড়বে নিছক ভ্রান্তি। কিন্তু মানুষ যে তার পরমকল্যাণকে লাভ করতে পারবে, তার আশ্বাস দিতে পারে একমাত্র ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

কান্ট আরও বলেন—"আমাদের নৈতিক চেতনা এই দাবি জানায় যে ধার্মিক অবস্থাই সুখী হবে। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তিকে আমরা সাধারণত সুখী হতে দেখি না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব ধার্মিক ব্যক্তিকে সুখী করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রায়শঃই দেখা যায় ধার্মিক ব্যক্তিরা এই জীবনে বহু দুঃখ কষ্টের দ্বারা পীড়িত হন এবং অধার্মিক ব্যক্তিরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। এই কারণেও কোন ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যেখানে সব অন্যায়ের সংশোধন করা হয় এবং ধার্মিক এবং অধার্মিক ব্যক্তি, তাঁদের নিজ নিজ কাজের প্রতিফল লাভ করে।" তাছাড়া যেহেতু এই জীবনে যেমন ধার্মিকতা ও সুখের মধ্যে কোন অনিবার্য সংযোগ নেই, তেমনি এই জীবনকে একটি ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেও সেই অনিবার্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে না—যা ধার্মিকতাকে সুখের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। তাই কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়, যিনি নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে ধার্মিকতা ও যুগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তিকে এই জীবনে সুখী করা না গেলেও ঈশ্বর পরবর্তী জীবনে সুখী করতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিক মার্টিন্যুর মতে—"নৈতিক দায়িত্ব ও নৈতিক আদর্শ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কার কাছে? সসীম মানুষের কাছে হতে পারে না, কারণ সসীম মানুষের পক্ষে মানুষের সব অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই দায়িত্ব কোন সর্বজ্ঞ অসীম পূর্ণ সত্তার। এই সত্তাই ঈশ্বর। তাছাড়া নৈতিক আদর্শের পূর্ণতা কোথায়? নিশ্চয়ই কোন সত্তার মধ্যে এই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করেছে, তা না হলে এই নৈতিক আদর্শ অবাস্তব ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। এই আদর্শ ঈশ্বরে পূর্ণতা লাভ করেছে।" সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।

সেন্ট আনসেল্মের বক্তব্য হল,—“আমাদের মনে এক পূর্ণ সত্তার ধারণা আছে। এই পূর্ণ সত্তা হল ঈশ্বর। ঈশ্বরের ধারণা এমন, যার থেকে পূর্ণতম ও মহত্তম কিছু চিন্তা করা যায় না। কিন্তু এই পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে তা কিভাবে পূর্ণ হতে পারে? অস্তিত্ব পূর্ণতার অন্তর্গত। যার অস্তিত্ব নেই তাকে পূর্ণ বলা যায় না। শুধু চিন্তায় যার অস্তিত্ব আছে তার তুলনায় চিন্তায় এবং বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে তা পূর্ণতর। আমাদের মনে যে পূর্ণ সত্তার ধারণা আছে বাস্তবে তার যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে আমরা অপর এক পূর্ণ সত্তার ধারণা করতে পারি, যার বাস্তবে অস্তিত্ব আছে। তাহলে শেষোক্ত সত্তা প্রথমটির তুলনায় অধিকতর পূর্ণ হবে। যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণতম বা মহত্তম; তার অস্তিত্ব শুধুমাত্র চিন্তায় নেই, বাস্তবেও আছে। কাজেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়—এমনভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না। অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের যে ধারণা, তার মূল কথা হল নিজে নিজে অস্তিত্বশীল হওয়া। যেহেতু ঈশ্বরের পূর্ণতা অসীম, তিনি কালে বা কালের দ্বারা সীমিত নন। কাজেই কোন বিশেষ কালে ঈশ্বরের অস্থিত্বশীল হওয়া এবং কোন বিশেষ কালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া, এই দুই সম্ভাবনাকেই বাতিল করা যায়। সুতরাং ঈশ্বরের নাস্তিত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই,—এমন হওয়াটা অসম্ভব।”[2]

মার্টিন্যু মনে করেন যে,—এই জগতের কারণ বা ভিত্তি হল আমাদের ইচ্ছার মত কোন ইচ্ছা। এরকম কোন কারণকে স্বীকার করে নিলেই আমরা কারণের কারণ সন্ধান করা রূপে যে অনবস্থা দোষের উদ্ভব ঘটে, তাকে এড়াতে পারি। আমাদের কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা ঐ কাজের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইচ্ছাকে প্রয়োগ করি তার সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেই। অনুরূপভাবে এই জগৎ যদি ঈশ্বরের কার্য হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা হিসেবে ঈশ্বরের প্রযুক্ত ইচ্ছার কথা আমরা ব্যক্ত করতে পারি। সুতরাং ঈশ্বর জগতের কারণ এই অর্থে যে, ঐশ্বরিক ইচ্ছা হল একটা শক্তি যা প্রাকৃতিক জগতে অন্তঃস্যূত এবং সব জাগতিক ঘটনার নিয়ামক নীতিরূপে ক্রিয়া করে। এই হেতু মার্টিন্যু আদি কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

---

[2] Proslgion, St Anselm, Chapter 2-2.

আধুনিক যুগে উইলিয়াম পেলে পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত যুক্তির সমর্থনে তার বক্তব্যকে উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেন। একটি ঘড়ির উপমার সাহায্যে তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, একটি মরুভূমিতে ভ্রমণ করতে করতে যদি দেখা যায় যে কোন একটা বড় পাথর পড়ে রয়েছে তাহলে তার উপস্থিতিকে আকস্মিক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ বাতাস, বৃষ্টি, উত্তাপ, আগ্নেয়গিরি স্বকীয় ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা তা সৃষ্ট মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ মরুভূমিতে কোথাও একটি ঘড়ি পড়ে থাকতে দেখলে কিন্তু অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। একটি ঘড়ির গঠনের জটিলতা, তার অংশগুলোর বিন্যাস এবং একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য অংশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি সকল কিছুই নির্দেশ করে যে, অংশগুলোর গঠন এবং অংশগুলোকে একত্রিত করে একটি কার্যকর যন্ত্রে পরিণত করা কখনই আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। ঘড়িটির নির্মাতা হিসেবে কোন বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে আমরা পারি না। অর্থাৎ ঘড়িটির নির্মাণের ব্যাপারে কোন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। পেলে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে, এই প্রাকৃতিক জগতও একটি জটিল যন্ত্র এবং ঘড়ির মতোই কোন বুদ্ধিময় সত্তার দ্বারা পরিকল্পিত। সৌরজগতে গ্রহগুলোর আবর্তন, পৃথিবীতে ঋতুচক্র, প্রাণীর জটিল দেহাবয়ব এবং তার দেহের বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক উপযোগিতা সবই উদ্দেশ্য সাধনকর্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। মানুষের মস্তিষ্কে সহস্র কোষের সুসংহতভাবে ক্রিয়া করা, চক্ষুর গঠন ও কৌশল এবং তার ক্রিয়া, সকল কিছুই প্রমাণ করে যে, একখণ্ড প্রস্তর যেমন প্রকার শক্তির যান্ত্রিক এলোমেলো ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে, উপরোক্ত জটিল সূক্ষ্ম বস্তুগুলো সেভাবে উৎপন্ন হতে পারে না।

পরিণামমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক বিশ্বজগত হল এমন জগৎ বা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন সৃষ্ট। পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত যুক্তি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে একজন সর্বজ্ঞ সত্তার বা উদেশ্য-সাধনকর্তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যিনি এই জগতের মধ্য দিয়ে তার কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেন। জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, ঐক্য স্পষ্টতই নির্দেশ করে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের

জন্যই এই জগতের সৃষ্টি। এই জগতের স্রষ্টা কোন সুদক্ষ কারিগর যিনি অসীম ও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। এই জগৎ তার উদ্দেশ্য সাধন করছে। এর স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর।

প্রকৃতির মধ্যে, বিশেষ করে জীবজগতের মধ্যে এই উদ্দেশ্য বা পরিণতির অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়, যা অবশ্যই নির্দেশ করে যে প্রকৃতির আড়ালে কোন উদ্দেশ্য সাধনকর্তার অস্তিত্ব আছে। এই উদ্দেশ্য বা পরিণতির অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশ ও কর্মের উপযোগী করে নির্বাচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোতে এমন সুসামঞ্জস্য বর্তমান যে, আমাদের মনে হয় যেন তাদের ঐ ভাবেই নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক উপযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রাণীরা যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে তার জন্য কারও আছে ধারালো নখ, কারও আছে শিং। শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলে ভালুকদের আছে বড় বড় লোম। জগতের সর্বত্রই রয়েছে এমন এক সূক্ষ্ম, সুনিপুণ নির্বাচন ব্যবস্থা যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে এই জগৎ উদ্দেশ্যমূলক। স্থলচর জীবদের রয়েছে ফুসফুস যাতে তারা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু মাছ যাতে জলে দ্রবীভুত বাতাস গ্রহণ করতে পারে তাই তার রয়েছে অন্য ধরনের শ্বাসযন্ত্র ফলিকা। পাখিদের শরীরের হাড় হালকা, যাতে তারা বাতাসে কম ওজনের জন্য উড়তে সক্ষম হয়। দুর্বল প্রাণীরা হয় সতর্ক এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন। কাজেই তাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। জগৎ জুড়ে এই উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব একজন উদ্দেশ্য সাধনকর্তার অস্তিত্বের অনুমানকে অনিবার্য করে তোলে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনকর্তা হলেন ঈশ্বর।

অচেতন প্রকৃতি জীব এবং জগতের মূল কারণ হলে তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য এবং উপায়ের যথাযথ সমন্বয় হতে পারে না। প্রকৃতির নির্দিষ্ট কোন্ কার্যটি পুরুষার্থের পক্ষে সহায়ক হবে, কোন্ কার্যটি তদনুকূল হবে না, অচেতন প্রকৃতির পক্ষে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অতএব, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতে হয়।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সবই যৌগিক পদার্থ এবং পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এই পদার্থগুলো সবই কার্য, যেহেতু এরা অংশের সমষ্টি, সাবয়বও সীমিত পরিসরযুক্ত। সুতরাং এদের কারণ থাকবেই। কারণ তিন

প্রকারের; যথা—(১) উপাদান কারণ (২) সাধারণ কারণ এবং (৩) নিমিত্ত কারণ। যেরূপ ঘটরূপ কার্যের উপাদান কারণ হল মৃত্তিকা আর নিমিত্ত কারণ হল কুম্ভকার। জগতের যৌগিক পদার্থগুলোর উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ আছে। এদের উপাদান কারণ হল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণু। এখন প্রশ্ন, **তাদের নিমিত্ত কারণ কে?** তাদের নিমিত্ত কারণ এমন কেউ হবেন যাঁর পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা আছে, যাঁর চিকীর্ষা (উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা) আছে এবং কৃতি (উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষমতা) আছে। অধিকন্তু তিনি না হলে পরমাণুর মত সূক্ষ্ম বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

যে সকল পদার্থের মাত্রাভেদ আছে, তাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তর থাকবেই। যেমন, আয়তনের দিক থেকে পরমাণু ক্ষুদ্রতম এবং আকাশ বৃহত্তম। জ্ঞান এবং শক্তিরও মাত্রাভেদ আছে, অর্থাৎ কারও বেশি এবং কারও তার তুলনায় কম। সুতরাং এমন কোন পুরুষ আছেন, যাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বোচ্চ সীমায়, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। মানুষের জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ, কারণ মানুষ সসীম জীব। কাজেই সেই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান পুরুষ ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের ফলে জগতের অভিব্যক্তি এবং বিয়োগের ফলে জগতের বিনাশ হয়। কিন্তু প্রকৃতি এবং পুরুষ বিরুদ্ধধর্মী। উদাহরণস্বরূপ—প্রকৃতি অচেতন, আর পুরুষ সচেতন। প্রকৃতি এবং পুরুষ বিরুদ্ধধর্মী হওয়ার কারণে তাদের সংযোগ বা বিয়োগ তাদের স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে না। এখন প্রশ্ন, বিরুদ্ধধর্মী প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটিয়েছে কে?

এর উত্তর এই যে,—কোন একজন সচেতন, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ পুরুষের সাহায্যে এই সংযোগ বা বিয়োগ সম্ভব হয়েছে। এই সংযোগ বা বিয়োগ সাধনকারী পুরুষই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

কর্মাকর্ম এবং অবিদ্যা আত্মার ভোগ এবং মুক্তির কারণ। এই কর্মতত্ত্বের নিয়ন্ত্রক হিসেবে এমন একটি পরমপুরুষের প্রয়োজন,—যিনি নিজে কর্মাকর্ম এবং অবিদ্যার অধীন নন। সুতরাং সেই পুরুষ ঈশ্বরই।

জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। কিন্তু জীব সীমিত বলে তার অচেতন প্রকৃতি ও নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকে না। তাই সে নিজের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অদৃষ্ট জীবের কর্মজাত শক্তি এবং অচেতন। প্রকৃতিও অচেতন। কাজেই অদৃষ্ট নিজে বা প্রকৃতি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অচেতন অদৃষ্ট এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন সচেতন, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন। সেই পুরুষই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

মানুষের অদৃষ্ট হল তার কর্মফলের ভাণ্ডারখানা। মানুষকে তার কর্ম অনুসারে ফলভোগ করতে হয়। অদৃষ্ট এক অচেতন শক্তি হওয়ার কারণে মানুষের কর্ম অনুসারে তার অদৃষ্টরূপ ভাণ্ডারখানা থেকে কর্মফলের ব্যবস্থা করার জন্য একজন সচেতন নিয়ন্তা দরকার। সেই নিয়ন্তাই হলেন ঈশ্বর।

এই জগতে সকল মানুষের অবস্থা এক রকম নয়। কেউ ধনী, আবার কেউ গরীব। কেউ সুখী, আবার কেউ দুঃখী। কেউ পন্ডিত, আবার কেউ মূর্খ। কিন্তু এই তারতম্যের কারণ কী? সর্বজনস্বীকৃত কার্য-কারণ নীতি অনুসারে এই তারতম্যের নিশ্চয়ই কারণ আছে। প্রত্যেক মানুষের অবস্থা তার কৃতকর্মের ফল। মানুষের সু-কর্ম সুফল প্রদান করে, আর কু-কর্ম কুফল প্রদান করে। মানুষের শুভাশুভ কর্মফল সঞ্চিত থাকে, এবং যেখানে সঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। সুতরাং অদৃষ্ট হল মানুষের শুভাশুভ কর্মফলের ভাণ্ডারখানা। মানুষ তার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। অদৃষ্ট জড় ও অচেতন পদার্থ। তাই প্রশ্ন জাগে, অদৃষ্ট কি করে মানুষকে তার যথাযোগ্য কর্মফল প্রদান করে? কারণ কোন জড় ও অচেতন পদার্থের পক্ষে যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকু দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অনুমান করা যায় যে, কোন সচেতন সত্তা এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

কে এই সচেতন সত্তা? এই সচেতন সত্তা তো জীবাত্মা হতে পারে না, যেহেতু জীব নিজে তার অদৃষ্টকে জানে না। সুতরাং জীবের পক্ষে তার অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায় যে, অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণকারী এই অচেতন সত্তা সর্বজ্ঞ

এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই নন। ঈশ্বরই পাপীর দুঃখভোগের এবং পুণ্যাত্মার সুখ-ভোগের ব্যবস্থা করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কান্টও অনুরূপ যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

ঈশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে সম্ভব করে তোলেন। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু এই জগতের অভিব্যক্তি। পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি নিত্য স্বতন্ত্র বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্না সত্তা। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নিত্য সত্তার মধ্যে কীভাবে যোগ ঘটতে পারে? একমাত্র কোন সর্বশক্তিমান পূর্ণ চেতন পুরুষের দ্বারা এই কার্য সম্ভব। এই পুরুষ কোন সাংসারিক জীব হতে পারে না। এই পুরুষ হল ঈশ্বর।

ঈশ্বরই বেদের রচয়িতা। বেদের সাহায্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। সকলেই স্বীকার করেন যে বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু বেদকে অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য মনে করার কারণ কী?

বেদের রচয়িতাই বেদের প্রামাণ্যের কারণ। আমরা বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করি বলেই যেমন বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করি, তেমনি বেদের রচয়িতাকে বিশ্বাস করি বলে বেদকে বিশ্বাস করি। এখন প্রশ্ন, বেদের রচয়িতা কে?

কোন মানুষের পক্ষে অভ্রান্ত বেদ রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ অসম্পূর্ণ, তাই মানুষের ভুল-ত্রুটি থাকবেই। সুতরাং বেদের রচয়িতা এমন কেউ হবেন, যিনি সম্পূর্ণ এবং সর্বজ্ঞন। সেই সম্পূর্ণ এবং সর্বজ্ঞ পুরুষই ঈশ্বর।

সাংখ্যদর্শনে মহর্ষি কপিল বলেছেন,—"বেদের কর্ত্তা কোন মনুষ্য নহে। বেদ ঈশ্বরীয় অভ্রান্ত জ্ঞান। জীবের জ্ঞান অভ্রান্ত নয় বলিয়া, জীবে বেদপ্রণয়ন শক্তির অভাবই দেখিতে পাওয়া যায়।"[3]

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ বলেছেন,—"বেদবাক্য বুদ্ধিপূর্বক। এখানে সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কোন কথা নেই। অতএব ইহা ঈশ্বরীয় জ্ঞান।"[4]

---

[3] ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ।—সাংখ্য দর্শন ৫।৪৬

[4] বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে।—বৈশেষিক দর্শন ৬।১।১

মহর্ষি পথঞ্জলি যোগদর্শনে বলেছেন,—"সেই (ঈশ্বর) এর সর্বজ্ঞ হওয়া এতটাই নিমিত্ত যে, তিনি ছাড়া আর কারোরই সেই সামর্থ্য নাই।[5]

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—"আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থপ্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই।"[6]

তদুপরি বেদে বহুবিধ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উল্লেখ আছে, যা সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্য নয়। সুতরাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই বেদের রচয়িতা বলে স্বীকার করতে হয়।

বৈদিক শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ—বেদ, উপনিষদ, গীতা সহ সকল শাস্ত্রই ঈশ্বর আছেন, এই কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে।

ঈশ্বর শরীররহিত, জন্মরহিত, লিঙ্গহীন, সর্বজ্ঞ, মঙ্গলময়, এক ও অদ্বিতীয়, সর্বদ্রষ্টা, ঈশ্বর দুষ্টের দমনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও স্রষ্টা।

এই সকল যুক্তি, শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—শাস্ত্রবাক্যকে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে মেনে নিব কেন? সাধারণ মানুষ মানলেও দার্শনিকেরা মানবেন কেন?

এর উত্তরে এটুকু বলা যায়, কোন বস্তুর অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হল তাকে প্রত্যক্ষ করা। ঈশ্বর সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। কারণ যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। "পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কান্ট (Kant) ও লটেজ (Lotze) স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেছেন যে, যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কারণ সব যুক্তিই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে পূর্বে স্বীকার করে নিয়েছে এবং পরে প্রমাণের চেষ্টা করেছে।"

---

[5] তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।—যোগদর্শন ১।২৫

[6] বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।
—শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৫।১৫

এখন প্রত্যক্ষই যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হয়, তবে যারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নি তাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্ত-বচনের উপর নির্ভর করা শ্রেয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হল। এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে,—

ঈশ্বরের বাসস্থান কোথায়?
তিনি আমাদের থেকে কত দূরে?

আব্রাহামিক রিলিজিয়ন বা ধর্মমতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীত হয় যে, ঈশ্বর কোন এক বিশেষ স্থানে (চতুর্থ আকাশ বা সপ্তম আকাশ ইত্যাদি) বিরাজমান। সেখানেই তাঁর বাসস্থান। তো সনাতন ঈশ্বরের বাসস্থান কোথায়? তিনি আমাদের থেকে কত দূরে?

ঈশ্বর যদি কোন এক স্থানে বিরাজমান থাকেন, তাহলে তাঁর পক্ষে সর্বস্থানের সমস্ত কিছু জানা সম্ভব নয়। কারণ যিনি সসীম বা সীমিত তিনি এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু জানতে পারবেন না। অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণরূপে জানতে হলে তাঁকেও অসীম হতে হবে। যে সকল বস্তু দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সসীম, যাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান তাদের কোন্‌টি কোথায় তা আমরা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা জানতে পারি। কিন্তু যিনি সমস্ত অন্তর্ভূত করে বিদ্যমান, যিনি অনন্ত, অসীম, যাঁর কাছে সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত, তাঁর কোনও নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করা অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বর এই সম্পুর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান—এমনটাই মানতে হবে। কিন্তু তিনি কীরূপে সর্বত্র বিরাজমান? সর্বত্র বিদ্যমান থাকলে আমরা কেন দেখতে পারি না?

"তিনি (ঈশ্বর) সর্বত্র গিয়াছেন, তিনি জ্যোতির্ময়, অশরীরী, ক্ষতরহিত, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বোপরি বিদ্যমান এবং স্বয়ম্ভু।"[7]

---

[7] স পর্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ কবির্মনীষী পরিভূঃ...—ঈশোপনিষদ ০৮

"সেই ব্রহ্মে চক্ষু গমন করে না অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না। বাগিন্দ্রিয় তথায় গমন করে না অর্থাৎ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশিত করা যায় না। মনও সেই ব্রহ্মে যায় না অর্থাৎ মনদ্বারাও তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না। আমরা তাঁহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর।"[৪]

অর্থাৎ ব্রহ্মকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, চক্ষুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। দেশকালাবচ্ছিন্ন স্থুল বস্তুকেই আমরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করতে পারি। কিন্তু যিনি দেশকালের অতীত, আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাঁকে চক্ষু দেখবে কিরূপে!

ব্রহ্মই দর্শনজ্ঞানের প্রকাশক। সুতরাং যা চক্ষুর জ্ঞানের প্রকাশক তাঁকে চক্ষু কি প্রকারে দর্শন করবে? মানুষের বাক্যও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যা উপলব্ধি করি অথবা মন দ্বারা যা চিন্তা করি, বাক্যদ্বারা তা-ই প্রকাশ করি। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়-মনেরও অতীত তাকে বাক্যদ্বারা কি প্রকারে প্রকাশ করা যাবে? সুতরাং আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিংবা মনের কোন ব্যাপার দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারি না। যেভাবে আমরা বাহিরের বস্তুসকল জেনে থাকি, সেভাবে ঈশ্বরকে জানা সম্ভব নয়।

বৃত্তিসম্পন্ন মন দ্বারা চৈতন্য-জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে মনন করা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে আমাদের যে বিষয়ানুভূতি হয় সেই অনুভূতিগুলিই মন মনন করতে পারে, কিন্তু মন কখনও ব্রহ্মকে মনন বা প্রকাশ করতে পারে না। মনের নিজস্ব কোন মনন জ্ঞানোৎপাদক শক্তি নেই। আত্মার চৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা সমুদ্রাসিত হলেই মনের মনন-সামর্থ্য জন্মে।

পুষ্পের সুগন্ধ আছে, তথাপি আমরা চক্ষু দ্বারা তাকে উপলব্ধি করতে পারি না; তার জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের (নাসিকা) সাহায্য প্রয়োজন। বাক্য শ্রবণও চক্ষু দ্বারা করতে পারি না, তার জন্য কর্ণের প্রয়োজন। চক্ষুর দ্বারা ফল দর্শন করা গেলেও তার স্বাদ চক্ষু দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না; জিহ্বার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই একেকটা ইন্দ্রিয়ের একেকটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের পরিপূরক হতে পারে না। যেখানে একটি ইন্দ্রিয় অন্যটির কার্য করতে পারে না,

---

[৪] ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥—কেনোপনিষদ ১/৩

সেখানে এরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কিরূপে জানা যাবে? সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; যখন অবিদ্যার গ্রন্থিসকল ছিন্ন হয়ে যাবে তখনি ঈশ্বরের উপলব্ধি আত্মায় প্রকাশ পাবে।

"সেই ব্রহ্মকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও তিনি গ্রহণীয় নন, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছে, সেই ব্যক্তি চিত্তের নির্মলতা সাধনের পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল (নিরবয়ব) ব্রহ্মকে দেখিতে পান (উপলব্ধি করেন)।"[9]

"মাকড়সা যেমন জাল দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, সেইপ্রকার পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় হইয়াও অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জাত তন্তুস্থানীয় নাম, রূপ ও কর্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন।"[10]

"মূর্খের দৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মকে চলমান বলিয়া মনে হয়, বাস্তবে তিনি না ত চলমান এবং না কেহ তাঁহাকে চালনা করিতে পারে। তিনি অধার্মিক, অবিদ্বান্, অযোগীদের নিকট হইতে দূরে কিন্তু ধার্মিক, বিদ্বান্, যোগীদের অত্যন্ত নিকটে।"[11]

অর্থাৎ পরমাত্মা সম্পূর্ণ জগৎকে যথাযোগ্যভাবে আপন গতিতে চালাচ্ছেন। অবিদ্বান্ ব্যক্তিরা মনে করে যে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলছেন। কিন্তু তিনি সর্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান, কখনো চলমান হন না। অতএব তিনি কখনো চলেন না। সেই পরমাত্মা সর্বদা একরস তথা নিশ্চল হয়ে পরিপূর্ণ আছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে এরূপ জানেন। অধার্মিক, অবিদ্বান্, বিচার-শূন্য, অজিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর-ভক্তি রহিত ইত্যাদি দোষ-যুক্ত মনুষ্য থেকে ঈশ্বর বহু দূরে। অর্থাৎ তারা যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত জন্ম-মরণাদি দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যত্র-তত্র

---

[9] ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৮

[10] যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৬।১০

[11] তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
—যজুর্বেদ ৪০।৫

ভ্রমণ করে। সত্যবাদী, সত্যকারী, সত্যমানী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বজনের উপকারক, বিদ্বান্, বিচারশীল পুরুষদের অত্যন্ত নিকটে তিনি।

সুতরাং অজ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর দূরে, অজানা, তমসাবৃত। জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর অন্তরে। অধার্মিকের কাছে তিনি কঠিন, তিনি দুর্গম, আবার তত্ত্বযোগী সাধকের কাছে তিনি সহজ, তিনি অন্তরতম।

কীভাবে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত করা যায়?

এর উত্তরে বলা যায় "ঈশ্বরকে অনুধাবন করতে পারা যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে।" কিন্তু সরাসরি ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাহলে কীভাবে ঈশ্বরকে (ঈশ্বরের ধারনাকে) প্রতিষ্ঠিত করব?

প্রমাণের অর্থ ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলো থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনার মাধ্যমে নির্ধারিত সুস্পষ্ট জ্ঞান। তবে লক্ষ্য করুন যে ইন্দ্রিয়গুলি বৈশিষ্ট্য, গুণ, ধর্মগুলো ধরতে পারে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণকে ধরতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন অগ্নিবীরের কোন আর্টিকেল পড়েন তখন আপনি অগ্নিবীরের অস্তিত্বকে ধরেন না, শুধুমাত্র কিছু ছবি আপনার স্ক্রীনে/পৃষ্ঠায় আসছে যা আপনি অর্থপূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন। তারপর আপনি উপসংহারে আসেন যে এই আর্টিকেল বা প্রবন্ধের কোনো না কোনো লেখক আছেই এবং আপনি দাবি করেন অগ্নিবীর এর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। এটিই হল 'পরোক্ষ প্রমাণ'—যদিও এটিকে 'প্রত্যক্ষ' বলে মনে হয়।

একইভাবে এই পুরো সৃষ্টি—যা আমরা দেখি এর বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করি। যখন আপনি একটি ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত ইনপুট কোন একটি বিষয়ের সাথে সরাসরি সংযোগ করতে পারবেন, তখন 'সরাসরি প্রমাণ আছে' আপনি এমন দাবি করবেন। উদাহরণস্বরূপ—যখন আপনি একটি আম ভক্ষণ করেন, তখন আপনি মিষ্টির বৈশিষ্ট্যকে অনুভব করে থাকেন এবং এটিকে আমের সাথে জুড়ে দেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আপনি এমন 'প্রত্যক্ষ প্রমাণের' সহযোগী হন শুধুমাত্র ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয় দ্বারা যেটি ঐ বৈশিষ্ট্যকে নিরীক্ষণ করেছে। এভাবেই পূর্বের উদাহরণ থেকে বলা যায় আপনি

শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণের মাধ্যমে আমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবেন না, আমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবেন শুধুমাত্র জিহ্বা, নাক বা চক্ষু দিয়ে। বাস্তবতায় এটাও 'পরোক্ষ প্রমাণ' যদিও এটাকে আমরা 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' রূপে মেনে নিয়েছি সহজভাবে বোঝার স্বার্থে।

এখন, ঈশ্বর যেহেতু সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিদ্যমান সত্তা, তাই চক্ষু, নাক, জিহ্বা, ত্বক বা কর্ণের মত মোটা ইন্দ্রিয়ের অঙ্গগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের সরাসরি প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ—আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমেও অতিআনবিক কণা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা অতিস্বনক শব্দ (ultrasonic sound) শুনতে পাই না এবং আমরা প্রতিটি অণুর স্পর্শ অনুভব করতে পারি না।

অন্য কথায়, এই অস্পষ্ট ও দুর্বল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা অসম্ভব, ঠিক যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণের মাধ্যমে আমকে অনুভূত হতে পারে না বা সাবটোমিক কণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা।

এমন কোন পথ আছে কি,—যাতে আমরা সরাসরি ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত করতে পারি?

ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে একমাত্র যে ইন্দ্রিয়, তা হলো মন। যখন মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিক্ষোভমুক্ত থাকে (সব সময় হাজার হাজার ভাবনা আসছে) এবং ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত করা হয়। ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হতে পারে বুদ্ধির মাধ্যমে, সেই একই ভাবে যেমনটা পূর্বে আমের স্বাদের প্রমাণ পেয়েছিলেন। ঈশ্বরকে অনুধাবন করাই জীবনের লক্ষ্য, এবং একজন যোগী এটাই করার উদ্যোগ নেয় মনকে নিয়ন্ত্রন করার নানা কৌশলের মাধ্যমে। যেখানে কিছু বিষয় অনুশীলন করা অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন অহিংসা, সত্যান্বেষা, ধৈর্য্য, সকলের জন্য শান্তি অন্বেষণ, উচ্চ মানবিক চরিত্র, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মনুষ্যগণের মধ্যে একতা ইত্যাদি।

একটি উপায়ে প্রতিদিন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সরাসরি প্রমাণ ইঙ্গিত পাই। যখন আমরা চুরি, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতার মত কোন ভুল কাজ করতে চেষ্টা করি, তখন আমরা ভয়, লজ্জা, সন্দেহের আকারে সেই অস্পষ্ট 'ভেতরের নির্দেশ' শুনতে পাই। এবং যখন আমরা অন্যকে সাহায্য করার মত মহান কাজে নিয়োজিত থাকি (একটি শিশুকে আশীর্বাদ করি) তখন আমরা আবার সেই 'ভেতরের নির্দেশ' শুনতে পাই ভয়হীন, সন্তুষ্টি, উৎসাহ এবং সুখের অনুভূতির আকারে। এই ভিতরের নির্দেশ ঈশ্বর প্রদত্ত।

অতএব, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রমাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যেমনভাবে অন্য সত্তাগুলো আমাদের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে।

ঈশ্বরের মূর্তি ও অবতার কল্পনার আদ্যোপান্ত

ঈশ্বর অনন্ত, আর অনন্ত ঈশ্বরের কোন মূর্তি থাকতে পারে না। অনেকে বলেন, এই বিশ্ব তাঁর মূর্তি, কিন্তু প্রকাণ্ড বিশ্ব তাঁর মূর্তি হতে পারে না, কারণ তাঁর অনন্ত স্বরূপের অতি অল্পই এর মধ্যে প্রকাশিত। মানব যত বড়ই হোক না কেন, সেও তাঁর মূর্তি হতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপ তার লক্ষ্যস্থল। যদি সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারে, তখন সে অনন্তস্বরূপের মধ্যে ডুবে যায়, কিন্তু তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বারা সে অনন্তস্বরূপকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে না। অন্য কোন্ যুক্তি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে? তিনি আপনা হতেই অসংখ্য প্রকার মুক্তি, অসংখ্য রূপ, সৃষ্টি করেছেন, এবং সকলই তাঁকে আশ্রয় করেই জীবিত আছে। কিন্তু কোন বস্তু ঈশ্বর নয়, এবং কোন মূর্তি বা রূপ ঈশ্বরের নয়।

সাকারবাদীগণ বলে থাকেন যে, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি আছে বলে তিনি যথেচ্ছ রূপ গ্রহণ করতে পারেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করেছেন। তা যে সম্ভব নয়, পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত রূপে তাই এখন আলোচনা করা যাক্।

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি আছে বলে তিনি যদি নিজের স্বীয় স্বরূপ বিনাশ করে অন্য স্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে আর তিনি ঈশ্বর থাকতে পারেন না। আরেকটি বিষয়,

ঈশ্বর আপন স্বরূপ রোধ করে থাকেন কেবল অপরের নিকট প্রকাশ বা দান করার উপলক্ষে, কিন্তু নিজের মধ্যে নয়। বিষয়টি বুঝতে যত কঠিন মনে হচ্ছে, একটি উদাহরণ দিলে তা তত কঠিন মনে হবে না। ধরুন, একজন অতি দয়ালু ব্যক্তি আছেন, অপরের দুঃখ দেখলে তিনি তাকে দুঃখমুক্ত না করে পারেন না। কোন মাদকসেবী টাকার অভাবে মাদক কিনতে না পেরে দুঃখিত হয়ে তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইল। দয়ালু ব্যক্তি স্বভাবতঃই তাকে টাকা দিবেন না। এখানে তিনি অপরের মঙ্গল কামনায় তার নিকটে নিজের দয়াবৃত্তি রোধ করলেন। ভিখারী দয়ার প্রকাশ না দেখে মনে করল দাতার দয়া নেই। কিন্তু দয়ালু ব্যক্তির দয়াবৃত্তি বিন্দুমাত্রও খর্ব হয় নি। তিনি যদি সত্য সত্যই তাঁর দয়াবৃত্তিকে নিজের মধ্যে লোপ করতেন,—যেমন মানুষ ক্রোধ ও লোভকে নিজের মধ্যে লোপ করে, তাহলে আর তিনি দয়ালু থাকতেন না। সেইরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট জীবের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশ বা দান বিষয়ে নিজেকে সংবরণ করতে পারেন, এর দ্বারা তাঁর স্বরূপের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না। কিন্তু যদি নিজের নিকট নিজের স্বরূপ রোধ করেন, তা হলে তাঁর ঈশ্বরত্ব থাকে না। তা মৃত্যুর নামান্তর। কিন্তু অনন্তস্বরূপ অমর ঈশ্বরের মৃত্যু নেই।

ঈশ্বরের মূর্তি গ্রহণ করার অর্থ, অসীম ব্রহ্মের ক্ষুদ্র হওয়া এবং ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য পরমাত্মার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ গ্রহণ করা। এটি অপরের নিকট নিজের স্বরূপ রোধ করা নয়। যেমন মানবকে স্বাধীনতা দান করার জন্য তিনি নিজের স্বরূপ রোধ করেছেন। যে মাতা সন্তানের মৃত্যু-শোকে ক্রন্দন করছেন, তার প্রতি দয়াবশে যদি কেউ সন্তানের রূপ ধরে এসে বলে, “এই যে আমি তোমার সন্তান”, তাহলে তার শত দয়া থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলে ঘৃণা করি, আর বলি—মিথ্যা দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করা অপেক্ষা শোক ভাল। আর ঈশ্বর বিষয়ে সাকারবাদীগণের এরূপ কল্পনা বাধে না!

পুরাণগুলোতে ঈশ্বর ও তাঁর স্বরূপের বহু মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে, এবং নানা বাহ্য উপকরণ ও আড়ম্বর সহ ঈশ্বরের পরিবর্তে সেই সকল মূর্তিরই পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুইটি কারণে এরূপ করা হয়েছে।

প্রথম, তাঁরা মনে করেছেন, সাধারণ অজ্ঞ লোকে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না এবং স্থুল বিষয় ব্যতীত ধর্ম (সে ধর্ম যাই হোক) আচরণ করতে পারে না। এরূপ মনে করে ঈশ্বরকে সত্যরূপে জানার পরেও, তাঁরা সাকার উপাসনাকে ধর্মের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। যারা এরূপ করেছেন তাঁরাই স্বার্থবাদী পুরোহিত। অতএব লোকে যখন বলে তাঁরা আপন স্বার্থের জন্য সমগ্র জাতিকে অজ্ঞতা ও কল্পিত উপাসনার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, তখন প্রতিবাদ করার বেশি কিছু থাকে না।

দ্বিতীয়, অনেকে বলেন, সাধারণ অশিক্ষিত লোক স্থুল সাকার মূর্তি ও স্থুল উপাসনা ব্যতীত নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধ্যান ধারণা ও পূজা উপাসনা করতে পারে না। ইহা সর্বথা অসত্য। যারা বাল্যকাল থেকেই কেবল সাকারবাদে অভ্যস্থ, কেবল তাদেরই নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। কিন্তু যারা শিক্ষা পায়, তাদের পক্ষে কঠিন হয় না। সাধারণ মানুষ নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না, এই মত মানব সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে অযুক্ত উচ্চ ধারণা থেকে উৎপন্ন।

তারপর গ্রন্থাদির জ্ঞান। জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের উদ্দেশ্য এই যে, মানব তা পাঠ করে ও অর্থ বুঝে সেই জ্ঞান আত্মস্থ করবে, পুস্তককে কেবল পূজা করলে তার উদ্দেশ্য কিছুই সফল হয় না, এবং যারা পুস্তকের জ্ঞান আত্মস্থ করেছেন তাদের পক্ষে যেমন যে পুস্তকের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, মূর্তি সম্বন্ধেও সেরূপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই সকল সাকার মূর্তি সম্বন্ধে এর বিপরীত হয়েছে, এবং এর দ্বারা ধর্মজগতে অনেক অমঙ্গল হয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি, মানুষ ঈশ্বর ও ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করে দেবদেবীর পূজা, তীর্থ, বলি, আড়ম্বর নিয়েই ব্যস্ত আছে, নানা কল্পিত কাহিনীকে সত্য বলে বিশ্বাস করছে, অনন্ত আদর্শ ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবে আছে, এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে।

অনন্ত ঈশ্বর কি স্থূল ও ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করে মানবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু বরণ করে মানবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন? যিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত, তাঁর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কোন অর্থ হয় না। হিন্দুধর্মে অবতারবাদ সমর্থন করার জন্য

পৌরাণিকগণ গীতার এই উক্তি সচরাচর উদ্ধৃত করে থাকেন,—"সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।"[12] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেন এরূপ বলেছেন তা পৌরাণিকগণ যুক্তি দিয়ে চিন্তা করেন না। যুক্তি পরের কথা, তাদের মন এমন অবতারবাদে পূর্ণ যে বর্তমান সময়েও অনেক মানুষকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় অবতার মেনে পূজা ও প্রচার করছেন। এবং সেই তালিকাও বৃহৎ।

অনন্ত পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র মানবরূপে অথবা অন্য কোন জীবরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারেন না, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ঈশ্বর যখন মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখন স্ব-স্বরূপেই করে থাকেন, অসত্য আকারে মানুষকে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যান না,—এটি তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। অতএব অবতার কল্পনা যখন স্ব-বিরোধী, তখন গীতার উদ্ধৃত উক্তি আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উক্ত শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—"যখন ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি (জন্মগ্রহণ করি)।"[13] উল্লেখ্য, মুক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মাগণ নিজের ইচ্ছামত জন্মগ্রহণ করতে পারেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলছে—"মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা শুনিতে ইচ্ছা করিলে স্বশক্তি দ্বারাই শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে ত্বক, দেখিবার সংকল্প হইলে চক্ষু, স্বাদ গ্রহণের জন্য ঘ্রাণ, সংকল্প বিকল্প করিবার জন্য মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত, অহংবুদ্ধির জন্য যেমন ইন্দ্রিয়গোলকের দ্বারা স্বকার্য সিদ্ধ করে, সেইরূপ মুক্ত অবস্থায় স্বশক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে।"[14]

শতপথের উক্ত শ্লোক থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়,—মুক্ত আত্মাগণ স্বীয় ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণও মুক্ত আত্মা ছিলেন, যার দরুন তিনি

---

[12] পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৮

[13] যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৭

[14] শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বম্ভবতি, পশ্যন চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন রসনা ভবতি, জিঘ্রন ঘ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন বুদ্ধির্ভবতি, চেতয়শ্চিত্তম্ভবত্যহওকুর্বাণো হঙ্কারো ভবতি॥
—শতপথ ব্রাহ্মণ, কাং ১৪

ইচ্ছা করেছিলেন যে, যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সাধুগণের রক্ষার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মগ্রহণ মুক্ত বা মোক্ষপ্রাপ্ত জীবাত্মার হয়, ঈশ্বর বা পরমাত্মার বা পরমেশ্বরের বা পরমব্রহ্মের নয়।

এছাড়াও "মুক্ত আত্মার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি থাকে, ইহা জৈমিনি মুনির মত। কারণ শাস্ত্রে বলা আছে যে, তাঁহাদের নানা রূপ দেহধারণ করার ক্ষমতা রহিয়াছে।"[15] "...তিনি (মুক্ত জীবাত্মা) এক প্রকার থাকেন, তিন প্রকার হন, পঞ্চ প্রকার, সপ্ত প্রকার এবং নব প্রকার হন...।"[16]

"তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁহার সহিত মিলিত হন। মাতৃলোক কামনা করিলে মাতৃগণের সহিত মিলিত হন। ভ্রাতৃলোক কামনা করিলে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারেন। ভগিনীলোক কামনা করিলে, বন্ধুলোক কামনা করিলে তাহাদের সহিতও মিলিত হন। এক কথায় তিনি যাহা চান তাহাই প্রাপ্ত হন।"[17]

অতএব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল যে তিনি পাপীদের বিনাশ ও সাধুদিগের রক্ষার জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করবেন। এই ইচ্ছা ঈশ্বরের নয়, কারণ সাধুদিগের ত্রাণ, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন, ঈশ্বর অন্য উপায়ে করে থাকেন, অবতার গ্রহণ করে নয়। আর পূর্বে ঈশ্বরের স্বরূপ সেরূপ বর্ণিত হয়েছে, সেরূপই যথার্থ।

অধিকন্তু মানুষ স্থূল বিষয়কে জীবনের সার মনে করে ঈশ্বরকেও স্থূলরূপে দেখতে চায়। কিন্তু স্থূল পদার্থ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে পারে না, তা সব সময়ে নিকটেও থাকে না। এর দ্বারা ভক্তির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হতে পারে না। ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণরূপে, আত্মার আত্মারূপে, অন্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে স্থূল পদার্থ প্রবেশ করতে পারে না। তিনি সর্বব্যাপী ও হৃদয়বাসী, যে চায় সে সর্বদাই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। স্থূল অবতারকে দেখার জন্য চক্ষুর প্রয়োজন, স্পর্শ করার জন্য হস্তের প্রয়োজন। এ সকল থাকা সত্ত্বেও বহু পূর্বেই অবতারের মৃত্যু হয়েছে বলে কেবল মৃৎপাষাণের মূর্তি বা ছবি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে

---

[15] ভাবং জৈমিনিঃ, বিকল্পামননাৎ।—বেদান্ত দর্শন ৪।৪।১১

[16] স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব।—ছান্দোগ্যোপনিষদ ৭।২৬।২

[17] ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮।২।১-১০

হয়। তারপর যখন চক্ষু দেখতে সমর্থ হবে না, হস্তের স্পর্শশক্তি থাকবে না, তখন কৃত্রিম মূর্তিও তৃপ্তি দিতে পারবে না।

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করাও যায় যে, ঈশ্বর পূর্ব যুগে মানব বা অন্য জীবদেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু সে দেহের ত মৃত্যু হয়েছে। বিশেষ কালে বিশেষ দেশে যদি তিনি দেহ ধারণ করে থাকেন, এখন ত তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সেই অবতার এখন ইহকালেও নেই, পরকালেও নেই, কারণ ঈশ্বর নিজের মায়া সম্বরণ করেছেন। তবে এখন সেই অবতারের কল্পিত মূর্তির উপাসনা করে লাভ কি? তা কি শূন্যের উপাসনা নয়? যাঁদেরকে অবতার বলা হয়, জীবিতকালে তাঁদেরকে ত কেউ অবতার বলে স্বীকার করেন নি। তাঁরা বর্তমানে আছেন, এই মিথ্যা কল্পনা মনে ধারণ করে উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। উপাসনা একমাত্র সত্য নিরাকার পরমেশ্বরকেই করা উচিত, এবং এটাই যথার্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবাত্মা

জীবাত্মা যে অমর, তা মানবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অমরত্ব আত্মার ধর্ম, মানুষ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত না হলে আত্মার অমরত্ব বুঝতে পারে না। যখন সে আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে নিজেই অনুভব করে যে, সে অনন্তকাল ঈশ্বরের সাথে বাস করছে এবং করবে। এমন কোন সময় ছিল না যখন সে ঈশ্বরের সাথে ছিল না, এবং এমন কোন সময় নেই যখন সে তাঁর সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু যখন সে শারীরিক ধর্মের অনুগত হয়ে কালযাপন করে, আত্মার স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করে না এবং শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে, তখনই সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়।

সৃষ্টির আভ্যন্তরিক রূপ যখন মানবের নিকট উদঘাটিত হয়, তখন সে অনুভব করে, যে সৃষ্টিকর্তা দেশে ও কালে তাঁর সৃষ্টি বিস্তৃত করে তার জন্যই জন্য অপেক্ষা করছেন। অনন্তকাল তার অপেক্ষা করেই প্রবাহিত হচ্ছে এবং অনন্তকাল তার অপেক্ষা করেই প্রবাহিত হবে। মানুষ তখন বুঝতে পারে, সে সময় অপেক্ষা বৃহত্তর,—তার মৃত্যু নেই।

ঈশ্বর যে আমাদেরকে স্নেহ করেন, তা অমরত্ব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, যারা এ স্নেহ অনুভব করে, তারা সহজেই মৃত্যুকে অস্বীকার করে। কোন্ মাতা তাঁর সন্তানকে বিনাশ করতে চান? মাতা বরং সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন। তিনি চান সন্তান বড় হোক, এমনকি তাঁর অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী ও জ্ঞানে চরিত্রে উন্নত হোক। এটিই প্রেমের ধর্ম। ঈশ্বরের প্রেম তা অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে না। মানুষের সাথে এ প্রেমের কেবল মাত্র ভিন্নতা এই যে, ঈশ্বর অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নেই, সে জন্য তিনি মানবকে নিজের ন্যায় করতে চান।

ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শ যখন হৃদয়ে লাগে, তখন মানবের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। সে দেখে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে সঙ্গীত প্রবাহিত করছেন, তাঁর সত্তা পূর্তিত যে প্রেম, পুণ্য, মঙ্গল সঙ্গীত উত্থিত হচ্ছে, তার সাথে সমগ্র জীবনের সুর মিলিয়ে গান

গাওয়ার জন্য তিনি আহ্বান করছেন। তাঁর সাথে একসুরে গান করার জন্য তাঁর প্রিয়জনকে আহ্বান করছেন। তখন মানব বুঝে যে, তার জীবন মৃত্যুর অতীত।

এর আগেও কিছু মানব এই অমর জীবনের আস্বাদ পায়। যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হয়, ততই নতুন নতুন কাজের আকাঙ্ক্ষা, অধিকতর সেবার আকাঙ্ক্ষা, মানবের মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর সময়ও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। যারা আত্মার অমরত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের উপাসনাদি করতে পারে নি, তারা অন্তরে গোপনে ব্যর্থতার দুঃখ নিয়ে ভাবে, "হায়! যখন শরীরের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসল, যখন আর অধিক সময় নেই, যখন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পড়েছি, তখনই বিধাতা জীবনে মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দিলেন, যা আর পূর্ণ হতে পারবে না।" কিন্তু তখন অমরত্বের আলোক জীবনকে নূতন, সবল ও আশান্বিত করে,—এ সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে পরলোকে বা পরবর্তী জন্মে। পার্থিব বস্তু পৃথিবীতেই রেখে যেতে হবে বটে, কিন্তু সেবা ও মঙ্গল কার্যের আকাঙ্ক্ষা এবং মানবকে উন্নত করার আশা পূর্ণ হওয়ার অসীম ক্ষেত্র পরলোক বা জন্মান্তরে আছে।

যে জীবনের শেষ দিনের কথা চিন্তা করে কল্পনানেত্রে দেখতে পায় যে, সে এমন এক স্থানে দাড়িয়ে আছে, যার পশ্চাতে এই পার্থিব জীবন, কিন্তু তা পরিত্যাগ করে যেতে হবে; সম্মুখে অন্ধকারময় শূন্য, যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে; সে ভয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম তার সকল ভয় দূর করে। যে ঈশ্বর তাকে স্নেহ করেন, তিনিই তার হাত ধরে ঐ অনন্ত অন্ধকার বা জ্যোতির পথে নিয়ে যাবেন। মাতার হাত ধরে সন্তানের নতুম দেশে যেতে কিসের ভয়?

জীবাত্মার স্বরূপ

সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হয়। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা অহঙ্কার, কোনটিই পুরুষ বা আত্মা নয়। পুরুষ বা আত্মা জ্ঞানের বিষয়ও নয়, এমন কি জাগতিক বস্তুও নয়।

পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ কী?

কঠোপনিষদ বলছে,—“এই আত্মা জন্মেও না মরেও না; এই আত্মা কোন কিছু হইতে হয় নাই, কোন কিছুও ইহা হইতে হয় নাই। এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত (অপরিবর্তনীয়), পুরান (চিরবিদ্যমান)। দেহ নিহত হইলেও এই আত্মা হত হয় না।”[18]

আত্মার স্বরূপ কিরূপ তা আমরা নিম্নোক্ত শাস্ত্র বাক্যগুলো থেকেও জানতে পারি,—

“ইনি (জীবাত্মা) অব্যক্ত, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য।”[19]

জীবাত্মা সর্বব্যাপী নয় অর্থাৎ জীবাত্মা একদেশী। জীবাত্মা শরীর থেকে ভিন্ন। কারণ আমরা নিজেকে বোঝাতে কখনো নিজের দেহকে নির্দেশ করি না। আমরা বলি ‘আমার দেহ’, ‘আমার হাত’, ‘আমার পা’। ফলে এই দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আমি নই। আমি কে? এই আমিই হলো আত্মা।[20]

দেহই যে আত্মা নয় বা দেহ ভিন্ন সত্তা, এর পেছনে আরেকটি যুক্তি হল মৃত অবস্থায় দেহ বিদ্যমান থাকে। তবুও তার মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, প্রযত্ন এসব বিদ্যমান থাকে না। বরং যার উপস্থিতিতে দেহে এসব গুণ বিদ্যমান থাকে, সেই হলো আত্মা।[21]

আত্মা আমাদের দেহে কোথায় থাকে? শাস্ত্রে বলা আছে এই আত্মা আমাদের হৃদয় গুহাতে থাকে।[22] তবে আমরা হৃদয় বলতে হৃৎপিণ্ড বললেও বৈদিক শাস্ত্রে হৃদয় শব্দ দ্বারা মস্তিষ্ক ও হার্ট উভয়কেই নির্দেশ করে (প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে)। কিন্তু আত্মার বাসস্থান সেই হৃদয় গুহা এক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্ক।

এই ক্ষুদ্র আত্মা প্রাণীর মস্তিষ্কে অবস্থান করে সমগ্র দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্দ্রিয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের, স্মৃতির, জ্ঞানের প্রভৃতির সংযোগ ঘটায়, সমন্বয় করে, নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ আত্মা মস্তিষ্কেরও মস্তিষ্ক।

---

[18] ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥—কঠোপনিষদ ১।২।১৮

[19] অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।২৪

[20] ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি।—সাংখ্য দর্শন ৬।৩

[21] ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।—ন্যায় দর্শন ১।১।১০

[22] স বা এষ আত্মা হৃদি—ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।৩।৩

আত্মাকে ধরা যায়না, ছোয়া যায়না, দেখা যায় না, ভেজানো যায়না, পোড়ানো যায়না, শুষ্ক করা যায় না ইত্যাদি। আত্মার পরিবর্তন হয় না। আত্মা সনাতন। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষ স্বপ্রকাশ, যেহেতু তাকে কেউ প্রকাশ করে নি; তার কোন কারণ নেই। পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় নিত্য বা শাশ্বত, যেহেতু পুরুষের উৎপত্তি নেই, আর বিনাশও নেই। পুরুষ জড় নয়, তবে জড়ের প্রকাশক। প্রকৃতির বিকার আছে, যেহেতু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, কিন্তু পুরুষ নির্বিকার, যেহেতু তার কোন পরিবর্তন নেই। পুরুষ সৃষ্টিও নয়, স্রষ্টাও নয়। প্রকৃতি দৃশ্য, আর পুরুষ প্রকৃতিজাত দ্রব্যের স্রষ্টা। প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু পুরুষ সচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত বলে তার সুখ, দুঃখ ও মোহ, কিছুই নেই। পুরুষ কর্তা নয়, পুরুষের বদন স্বাভাবিক নয়। অহঙ্কারবশত পুরুষ যখন নিজেকে কর্তা মনে করে, তখনই বন্ধন প্রাপ্ত হয়। আসলে পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ

শরীর কিংবা ইন্দ্রিয় আত্মা হতে পারে না। আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। শরীর আত্মা হলে, অর্থাৎ শরীর ও আত্মা অভিন্ন হলে শরীরের কোন অঙ্গের নাশে শরীরের নাশ হলে আত্মারও নাশ হয়—একথা বলতে হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করলে স্মৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের কোন অঙ্গের নাশে আত্মার নাশ স্বীকার করলে শরীরের ঐ অঙ্গের নাশের পূর্বে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করা সম্ভব হবে না। স্মৃতির ব্যাখ্যার জন্য শরীরাতিরিক্ত এক অভিন্ন সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল শরীর আত্মা হতে পারে না।

আবার ইন্দ্রিয় ও আত্মা অভিন্ন হলে অনুসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করা যাবে না। 'যে আমি ঘটকে দেখেছিলাম সেই আমি এখন ঘটকে স্পর্শ করছি' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা আমাদের হয়। এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে প্রত্যক্ষ কর্তা ও স্পর্শকর্তা অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পর্শ স্থলে যে ইন্দ্রিয় কাজ করে ও প্রত্যক্ষ স্থলে যে ইন্দ্রিয় কাজ করে তা ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও আত্মা অভিন্ন হলে স্বীকার করতে হয় যে, অনুভব হয়েছে একজনের আর স্মরণ হচ্ছে অন্যজনের। কিন্তু

অনুভবকর্তা ও স্মরণকর্তা অভিন্ন না হলে স্মরণ সম্ভব হয় না। অভিন্ন আত্মা স্বীকার না করলে অনুভব হবে একজনের আর স্মরণ হবে অন্যের। সুতরাং শরীর ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন এক নিত্য আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

ঘট, পট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সংঘাত, অর্থাৎ সাবয়ব অভূদ্রব্য পর প্রয়োজন সাধন করে। এরা যার প্রয়োজন সাধন করে তা জড়দ্রব্য হতে পারে না, যেহেতু প্রত্যেক জড়দ্রব্যই অপরের প্রয়োজন সাধন করে। সুতরাং এমন কোন চেতন সত্তা আছে, যার প্রয়োজন জড়দ্রব্যগুলি মিটায়। এই চেতন সত্তা'ই পুরুষ বা আত্মা।

মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় জড়দ্রব্য অচেতন; তাই তারা নিজেদের নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যেমন একটি মোটর গাড়ী নিজে নিজে চলতে পারে না, তাকে চালানোর জন্য একজন চালক দরকার। সেরূপ যাবতীয় জড়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন চেতন নিয়ন্ত্রক দরকার, সেই চেতন নিয়ন্ত্রকই পুরুষ বা আত্মা।

জগতের প্রত্যেক দ্রব্যই সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও বিষাদাত্মক। কিন্তু সুখ, দুঃখ এবং বিষাদ অনুভূতির বস্তু,—কোন জড় ও অচেতন দ্রব্য সুখ, দুঃখ ও বিষাদকে অনুভব করতে পারে না। সুতরাং সুখ-দুঃখাদিকে ভোগ করার জন্য চেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এই চেতন সত্তাই হল পুরুষ বা আত্মা।

দৃশ্য এবং দ্রষ্টা যে ভিন্ন, এই কথা স্বীকার করতেই হয়। আর দৃশ্য থাকলে দৃশ্যের দ্রষ্টার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। জগৎ দৃশ্যমান; সুতরাং এই জগতের দ্রষ্টারূপী সচেতন ও ত্রিগুণাতীত নিত্য সত্তার অস্তিত্বও স্বীকার করতেই হবে। সেই সত্তাই হল পুরুষ বা আত্মা।

শাস্ত্র ও মহর্ষিগণের মতে কৈবল্য বা মুক্তিই জীবের কাম্য। মুক্তির অর্থই হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। প্রকৃতিজাত যাবতীয় দ্রব্যই স্বরূপত দুঃখযুক্ত। যা দুঃখস্বরূপ তার দুঃখ নিবৃত্তির প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং প্রকৃতিজাত জগতের অতিরিক্ত কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে, যার পক্ষে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির প্রচেষ্টা সম্ভব হয়। সেই সত্তাই হল পুরুষ বা আত্মা।

পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির বিবর্তন হয়। সংঘাত পদার্থ মাত্রেই যা সংঘাত নয় এতাদৃশ সরল কোন তত্ত্বের প্রয়োজন সাধন করে। প্রকৃতির যাবতীয় সৃষ্টি যৌগিক। উপাদান এবং বস্তুসমূহ একে অন্যের সাথে মিলে কাজ করে। এই মিলনমিশ্রণের নাম-ই সংঘাত বা সংহতি, সংযোগ, যোগাযোগ। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি আত্মার উদ্দেশ্য সাধন করে। বিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক। সংঘাত না হলে বিবর্তন হয় না। প্রকৃতির সংঘাত এবং বিবর্তন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। পুরুষার্থ হেতু প্রকৃতির পরিণাম হয়। পরার্থে প্রকৃতির পরিণাম হয়। এটি উদ্দেশ্য প্রমাণ।

যাবতীয় ব্যক্ত বস্তু ত্রিগুণের সৃষ্টি। ত্রিগুণাত্মক বস্তু অবভাস-বিশিষ্ট। কতক ত্রিগুণাত্মক বস্তুর অবয়ব থাকে, কতগুলোর বিয়ব না থাকলেও অবভাস আছে। এ জন্য এদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব আছে, উৎপত্তি এবং লয় আছে। গুণসমূহের কাজ নিরীক্ষণ করার জন্য একজন সাক্ষীর প্রয়োজন, যিনি নিজে গুণাতীত হবেন। আত্মা এরূপ একটি সাক্ষীস্বরূপ তত্ত্ব। নিস্ত্রৈগুণ্য আত্মা (পুরুষ)-র ধারণার সঙ্গেই একজন স্থায়ী সাক্ষীর ধারণা যুক্তিসংগত। গুণাতীত আত্মার ধারণা এই কারণে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন প্রকার উপাদানের তৈরি বস্তুসকল এবং বুদ্ধি মন, অহং, ইন্দ্রিয় তথা দৈহিক সত্তা বিপর্যয়ের অধীন। এজন্য এই তিন প্রকার উপাদানের অতীত একটি সত্তা থাকা আবশ্যক। সেটিই আত্মা ।

জ্ঞাতা না হলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞানক্রিয়ার প্রবর্তনা এবং সমন্বয়ের জন্য একটি চিৎ-সত্তারূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বের আবশ্যক। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার ঐক্যসাধনের নিমিত্ত, ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখার নিমিত্ত, কারণস্বরূপ একটি সচেতন সত্তার আবশ্যক, যা নিজে কোনপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। এই তত্ত্বটি পুরোপুরিভাবে এবং বিশুদ্ধ অর্থে চৈতন্যযুক্ত না হলে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার সমন্বয়-কর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে। আত্মা এরূপ একটি তত্ত্ব,—যা সমস্ত অভিজ্ঞতার, সমস্ত চৈতন্যের স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতির, বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের মূল অধিষ্ঠানতত্ত্বস্বরূপ।

আত্মার অস্তিত্বের অনুকূলে উপরোক্ত প্রমাণটি তত্ত্ববিদ্যাসম্মত।

প্রকৃতি অচেতন। এটি নিজে নিজের কার্য উপলব্ধি করতে পারে না। প্রকৃতি ভোগ্য। ভোগ্য কখনও ভোক্তা হতে পারে না। কার্য দেখে কারণের অনুমান করতে হয়। সুখ, দুঃখ এবং মোহ যার স্বরূপ নয় এরূপ একটি তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতির সাথে সম্মিলিত অবস্থায় থাকার ফলে পুরুষের সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হয়। এটিই ভোগ। ভোক্তা না থাকলে ভোগ নিরর্থক।

উপরোক্ত প্রমাণটি নীতিবিদ্যাগত।

বন্ধন থেকেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে। বদ্ধদশায় সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই বেশি মনে হয়। দুঃখ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মুক্তিলাভ করতে হলে প্রকৃতি এবং পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন, এরূপ দৃঢ় জ্ঞান আবশ্যক। এজন্য কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তির জনক হিসেবে পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্যই মানতে হয়।

আমাদের ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু কোন স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা না হয়, তবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন কোন একটি বস্তুকে সুখপ্রদ মনে করলে তা পেতে চেষ্টা করি বা দুঃখপ্রদ মনে করলে বর্জন করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোন বস্তুকে লাভ করার আগে ঐ বস্তু সুখপ্রদ না দুঃখপ্রদ তা মনে করি কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, অতীতে যে বস্তুকে লাভ করে সুখ পেয়েছি, তার সঙ্গে এই বস্তুর সাদৃশ্য আছে বলে তাকে সুখপ্রদ মনে করি। যদি কোন স্থায়ী আত্মা না থাকে, তবে অতীতের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করবে কে? এবং অতীতের বস্তুর সঙ্গে যে এই বস্তুর সাদৃশ্য আছে তাই বা লক্ষ্য করবে কে? সুতরাং ইচ্ছা, সুখ বা দুঃখের অনুভূতি স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আমাদের মনের সঙ্গে যখন শুদ্ধ আত্মার সংযোগ ঘটে তখন আত্মা সম্পর্কে সাক্ষাত জ্ঞান জন্মে। যখন আমি বলি, 'আমি আছি' তখন আমাদের আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। আবার শুদ্ধ আত্মাকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায় না, তবে আত্মার গুণ বা ক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন একটি কমলার রঙ, আকার প্রভৃতি গুণগুলো সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করে আমরা বলি যে, আমরা উক্ত গুণগুলোর আধাররূপী কমলার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি। তেমনি ইচ্ছা,

সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণগুলোকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করে এই গুণগুলোর আধাররূপী আমাকে প্রত্যক্ষ করি—এই কথা বলতে পারি এবং আমাদের এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় তখন, যখন বলি, 'আমি ইচ্ছা করি', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', ইত্যাদি। কিন্তু অপরের আত্মাকে জানতে হলে তাদের ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করে তাদের আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করে নিতে হয়।

"ঈচ্ছা, দ্বেষ, প্রয়ত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান যে বস্তুতে বিদ্যমান থাকে সেইখানে আত্মার সিদ্ধি হয়।"[23]

চক্ষু, নাক, ত্বক এইসব ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শুধু যথাক্রমে দর্শন, ঘ্রাণ গ্রহণ ও অনুভূতি এই এক প্রকারের বিষয়কেই জানিতে পারি। কিন্তু এই সব ইন্দ্রিয়ের সমন্বয় করে যে সব বিষয়ের জ্ঞান রাখে সেই হল আত্মা। জ্ঞানের মধ্যকার সংযোগ সৃষ্টিকারী হল আত্মা। যেমন আমরা এক চক্ষু বন্ধ রাখিয়া যদি অন্য চক্ষু দিয়া কিছু দেখি তবে বন্ধ চক্ষুটিও এই বস্তুটির জ্ঞান লাভ করে। এই যে জ্ঞানের সমন্বয়কারী, ইহাই হল আত্মা। পূর্বের স্মৃতির সাথে বর্তমান ইন্দ্রিয়ের সংযোগকারী হল আত্মা। যেমন, আমি পূর্বে একদিন মিষ্টি খাইয়াছিলাম, আজ হঠাৎ মিষ্টি দেখিবার কারণে জিহ্বায় জল আসিয়া গেল। এই দর্শনেন্দ্রিয় ও জিহ্বার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টিকারী হল আত্মা।" (ন্যায়দর্শন ৩।১।১,৭,১২)

"জীবাত্মার অস্তিত্বের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না কারণ তাহার নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[24]

"দেহাদির অতিরিক্ত বিচিত্র সৌন্দর্য্য জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়। দেহের ধর্ম ব্যতীতও বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র জ্ঞান, বিচিত্র সুখ ও দুঃখের অনুভূতি, বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র প্রতিভা জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে।"[25]

"আমার শরীর, আমার মন ইত্যাদি ষষ্ঠী বিভক্তির কথন সর্ববাদী সম্মত। ইহাতেই শরীর হইতে জীবাত্মা ভিন্ন প্রমাণিত হইতেছে।"[26]

---

[23] ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।—ন্যায় দর্শন ১।১।১০

[24] অস্ত্যাত্মানাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ।—সাংখ্য দর্শন ৬।১

[25] দেহাদিব্যতিরিক্তোহসৌবৈচিত্র্যাৎ।—সাংখ্য দর্শন ৬।২

[26] ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি।—সাংখ্য দর্শন ৬।৩

"'আমি আছি' এই প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা সিদ্ধ হয় যে আত্মা রহিয়াছে।"[27]

উপরোক্ত যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ আত্মার অস্তিত্বের স্বাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

জীবাত্মা কি এক না কি বহু?

অদ্বৈতবাদীদের মতে সকল জীবদেহে একই আত্মা বিরাজ করে, আত্মার একত্বের ধারণা যদিও নিম্নোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়, তথাপি পরবর্তীতে এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত, তবে একজনের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অপর লোকেরও জন্ম বা মৃত্যু হত। একজনের কোন ইন্দ্রিয় বিকল হলে অপর লোকের ইন্দ্রিয়ও বিকল হত। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, পুরুষ বা আত্মা এক নয়,—বহু।

পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত তবে সকল লোকই একসঙ্গে এক কাজ করত। যেমন, একজন ঘুমালে অপর লোকও ঘুমাত; একজন গান করলে অপর লোকও গান করত। কিন্তু আসলে তা হয় না। একজনকে নিদ্রামগ্ন দেখলে অপর একজনকে কর্মব্যস্ত দেখা যেতে পারে। সুতরাং পুরুষ বা আত্মা এক নয়, বহু।

মানুষ একদিকে যেমন ঈশ্বর নয়, অপরদিকে পশুপক্ষীও নয়। সকলেরই যদি একই আত্মা হত তবে ঈশ্বর, মানুষ এবং পশুপক্ষীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। এতেও প্রমাণ হয় যে, পুরুষ বা আত্মা এক নয়, বহু।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের বিপর্যয় বা ভিন্নতার দ্বারাও আত্মার বহুত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন, যে ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান হয়, সে সুখী হয়, যার মধ্যে রজোগুণ প্রধান হয়, সে দুঃখী হয়, আর যার মধ্যে তমোগুণ প্রধান হয়, সে মোহযুক্ত হয়। সকল লোকের মধ্যে যদি একই আত্মা বিরাজ করত, তবে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী এবং কেউ মোহযুক্ত হত না।

---

[27] অহমিতি শব্দস্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্।—বৈশেষিক দর্শন ৩।২।৯

পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত, তবে কোন এক ব্যক্তির মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অপর ব্যক্তিরাও মুক্তিলাভ করত। কিন্তু তা যখন হয় না, তখন পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব স্বীকার করতেই হয়।

সমস্ত আত্মা মিলে এক-অখণ্ড হলে একটির জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে অন্যটিরও যুগপৎ জন্ম-মৃত্যু হত। একের কার্যের সঙ্গে অন্যের কার্যেরও যুগপৎ সঙ্গতি থাকত। একের সুখ-দুঃখ বোধের সঙ্গে অন্যেরও একই সময়ে এবং একইভাবে সুখদুঃখ বোধ হত। কিন্তু তা হয় না। অতএব প্রত্যেকটি ব্যক্তির আত্মা-ই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ আত্মা বহু।

আত্মা একটি অখণ্ড তত্ত্ব হলে সমস্ত ব্যক্তির চৈতন্যের গঠন একই প্রকারের হত। একের যে নিয়মে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হত, অন্যেরও ঠিক একই নিয়মে একই বিষয়ে প্রবৃত্তি হত। একের ভোগ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও তদ্রূপ ভোগ এবং মুক্তি আকাঙ্ক্ষা হত। কিন্তু তা হয় না। অতএব, আত্মা বহু।

বদ্ধ আত্মা ত্রিগুণের অধীন বলে অসংখ্য এবং বিচিত্র। বদ্ধ আত্মা নানা বিপর্যয়ের অধীন। মুক্ত আত্মা গুণাতীত হলেও সংখ্যায় অসংখ্য। মুক্ত আত্মা অভিন্ন কোন তত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয় না। সুতরাং, মুক্ত আত্মারও অভিন্ন হবার কোন কারণ নেই। এই যুক্তিতেও আত্মা বহু।

সাংখ্য দর্শনকার মহর্ষি কপিল বলেছেন,—"জীবাত্মা যে বহু তাহা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার জন্ম ও ভোগের বিচিত্রতা দেখিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে।"[28]

"জীবাত্মার একত্ব স্বীকার করিলে সংসারে প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার সুখদুঃখের অনুভূতি ও পরস্পরের বিরুদ্ধ ধর্মত্ব দেখা যাইত না।"[29]

[28] জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।—সাংখ্য দর্শন ১।১৪৯

[29] এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরূদ্ধধর্মাধ্যাসঃ।—সাংখ্য দর্শন ১।১৫২

"বামদেব আদি ঋষিগণ মুক্ত হইয়া গিয়াছেন অথচ আমরা বদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি। যদি আত্মা একই হয় তাহা হইলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই।"[30]

"সুখ দুঃখ আদি অসংখ্য চিহ্ন দ্বারা একাত্মতত্ত্বের খণ্ডন হইতেছে। সেই কারণ জীবাত্মা এক নহে। সংসারে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ মানুষ, কেহ পশু ইত্যাদি অসংখ্য ভেদ দেখিয়া নিশ্চয় হইতেছে যে জীবাত্মা এক নহে,—বহু।"[31]

"পুরুষের বিচিত্র জন্ম ও সুখ দুঃখের বিচিত্র ভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া জীবাত্মারূপ পুরুষ যে বহু তাহার কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।"[32]

উপরোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে **'জীবাত্মা বহু'**—প্রমাণ হল।

অদ্বৈতবাদ বিষয়; এক আত্মাই সমগ্র?

অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের ভ্রান্ত প্রকাশ। মায়ার প্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রকাশিত হন। জগতের কোন সত্তা নেই, এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বা ভ্রম-প্রত্যক্ষের বস্তুর ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র; এটি মায়ার সৃষ্টি। এই মায়া ব্রহ্মেরই একরকম শক্তি এবং এটি অবর্ণনীয়। ব্রহ্মের এই মায়াশক্তি যাদুকরের যাদুশক্তির ন্যায় মানুষকে ভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। যাদুকর যেমন তার যাদুশক্তির বলে একটি টাকাকে অনেক টাকা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে পারেন, তেমনি ব্রহ্মও তাঁর এই মায়ারূপ শক্তির দ্বারা অজ্ঞ মানুষকে অসত্য জগৎকে সত্য বলে মনে করাতে পারেন। যাদুকরের একটি টাকাকে বহু টাকা দেখাতে পারার কারণ হল তার যাদুশক্তি এবং মানুষের একটি টাকাকে বহু টাকা দেখার কারণ হল তাদের অজ্ঞানতা। অনুরূপভাবে বলা যায়, ব্রহ্মের মায়াশক্তি জগৎ দেখায়, আর

---

30 বামদেবাদির্মুক্তো ন।—সাংখ্য দর্শন ১।১৫৭

31 নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ।—সাংখ্য দর্শন ৫।৬১

32 পুরুষবহুত্বংব্যবস্থাতঃ।—সাংখ্য দর্শন ৬।৪৫

সাধারণ মানুষ অজ্ঞ বলিয়া তা দেখে। যাদুকর যেমন জানেন যে, তাঁহার যাদুশক্তি ফাঁকি ছাড়া আর নয়, তেমনি ব্রহ্মও জানেন যে, তাঁহার মায়াশক্তি কিছুই নয়।

ব্রহ্ম কি সত্যিই যাদুকরের ন্যায়? না। ব্রহ্ম যাদুকরের ন্যায় হতে পারেন না, কারণ যাদুকর ভ্রান্ত ও মানুষকে অসত্য বলেন,—যেটা ঈশ্বরের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বদা সত্য বলেন ও সেই মার্গে গমনের জন্য জীবদের প্রেরণা প্রদান করেন। যিনি সমস্ত কিছুর আধার, তাঁর মিথ্যা বা মায়ার জগৎ জীবদের দেখানোর প্রয়োজন নেই। যদি প্রয়োজন হয়, তবে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। আচার্য শঙ্কর বলেন, মানুষ অজ্ঞানতা-বশতঃ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যেমন ভেদ কল্পনা করে, তেমন জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কল্পনা করে এবং ভেদ কল্পনা করে বলেই ব্রহ্মে নানাবিধ গুণ আরোপ করে। কিন্তু এই ভেদাত্মক গুণগুলো বাস্তবিক নয়, এরা মায়িক ও প্রাতিভাসিক। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও বস্তুত তারা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নয়।

আত্মার বন্ধন হল দেহের সঙ্গে আত্মার একাত্মতাবোধ। আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা নিজেকে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা মনে করে। ফলে দেহের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক প্রভৃতিকে নিজের বলে মনে হয়। এটাই আত্মার বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় আত্মা তার ব্রহ্মত্ব বিস্তৃত হয়। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের এই অভাবই তাহর বদ্ধাবস্থার কারণ।

বস্তু মাত্রই হয় সৎ, না হয় অসৎ হবে। সৎ এবং অসৎ স্ববিরোধী। স্ববিরোধী দু'টি গুণ কারও বেলায় একই সময়ে একই অর্থে সত্যও হতে পারে না, আবার মিথ্যাও হতে পারে না। তা যদি হয়, মায়া সৎও নয় এবং অসৎও নয়, তা কেমন করে বলা যায়?

মায়া যদি ব্রহ্মের শক্তি হয়, ব্রহ্মকে আশ্রয় করে তাকে অবস্থান করতে হয়। কিন্তু মায়া অজ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে তার স্থান হয় কেমন করে। অধিকন্তু ব্রহ্মে যদি মায়ার আশ্রয় হয়, তবে ব্রহ্মের স্বরূপের ব্যাঘাত ঘটে। তিনি আর সর্বজ্ঞ থাকেন না। আবার, ব্রহ্মের অতিরিক্ত যদি মায়ারূপ কোন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার

করতে হয়, তবে অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না। মায়া জীবকে আশ্রয় করেও অবস্থান করতে পারে না; যেহেতু জীবও মায়ার সৃষ্টি। জীব যদি মায়ার সৃষ্টি হয়, তবে মায়া কারণ এবং জীব কার্য; এবং কারণ কোন সময় কার্যের উপর নির্ভর করতে পারে না। মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম চিরপ্রকাশমান। আবার, মায়া যদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান হয়, তবে মায়া ব্রহ্মকে লুকিয়ে রাখারূপ ক্রিয়া করে কেমন করে? কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব বলিয়া স্বীকৃত। অভাব পদার্থের কোন ক্রিয়া থাকা ত সম্ভব নয়।

তর্কের খাতিরে মায়াকে যদি বাস্তবও মনে করি, তবে ব্রহ্ম-জ্ঞানে তা নষ্ট হয় কেমন করে? অস্তিত্বশীল কোন বস্তু ত জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে না।

"'এ সংসারটা ধোঁকার টাটি' যদি মেনে নেই তাহলে আমাদের দেশ-কাল-সমাজ-ইতিহাস, আমাদের সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম সব তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। আমাদের বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রাঃ' অর্থাৎ 'কে তোমার প্রিয়া, কে তোমার সন্তান' ভাবলে আমাদের বাস্তব জীবনে দুঃখের নিদান খোঁজা অর্থহীন। যখন বাস্তবে বাহ্যজগতের অস্তিত্বই নেই তবে কিসের দুঃখ, কিসের জীবনসংগ্রাম? মাথাই নেই তো মাথাব্যথা!"[33]

আচার্য শঙ্কর অনুমোদন করছেন যে, শূদ্র যদি কান দিয়ে বেদ শোনে তবে শাস্তিস্বরূপ তার কানে গরম সীসা ঢেলে দিতে হবে, বলা বাহুল্য অন্য শাস্তিও অনুমোদিত।[34]

প্রশ্ন হল—যদি সবই ব্রহ্মময় হয়, যদি ব্রহ্মের সঙ্গে নম্বুদ্রিব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য ও শূদ্রের কোন ভেদ না থাকে তাহলে তাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় শাস্তি দেওয়ার বিধান কেন? তাহলে কি ব্যবহারিক জগৎ শঙ্করাচার্যের্ট জন্যেও বিশেষভাবে অস্তিত্ববান? গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বলে,

---

[33] অদ্বৈত বেদান্ত বা মায়াবাদঃ শংকরাচার্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা— রঞ্জন রায়।

[34] শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ শৃতেশ্চ"—ব্রহ্মসূত্র ৩।৯।৩৮, শাঙ্করভাষ্য

এই জগৎ আশ্রয়রহিত, মিথ্যা ও ঈশ্বর ব্যতিরেকে স্ত্রী-পুরুষেরা সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। সেইজন্য ভোগ করা ভিন্ন আর কি আছে?”[35]

পরিশেষে বলা যায়, অদ্বৈত মতবাদ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর; কারণ ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয় এবং সব রকমের ভেদ যদি মিথ্যা হয়, তা হলে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সত্য-অসত্য প্রভৃতির ভেদকেও মিথ্যা বলতে হয়। তাই কোন স্থলে একজন বলেছেন,—“অদ্বৈতবাদ ও জাতিভেদই পতনের মূল কারণ।”

জীবাত্মার পরিমাণ কতটুকু?

বেদাদি শাস্ত্রে জীবাত্মার শরীর থেকে নিষ্ক্রমণ ও নানা স্থানে গমন এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এটা তখনই সম্ভব হবে যদি আত্মা সসীম, আকারযুক্ত হয়। তবে সেই পরিমাণ কতটুকু?

জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম বলতে পরিমাণ বুঝায় না। সূক্ষ্ম এবং আকারে সীমিত এটাই বুঝায়, তবে সে অসীম ভাবযুক্ত হতে সমর্থ। যেহেতু জীবাত্মা সূক্ষ্ম, সেজন্য তা দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার যদি তাকে সর্বব্যাপী বলা হয় তাহলেও বেদাদিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হবে।

আত্মাকে ধরা যায় না, ছোয়া যায় না, দেখা যায় না, ভেজানো যায়না, পোড়ানো যায়না, শুষ্ক করা যায়না ইত্যাদি। আত্মার পরিবর্তন হয়না। আত্মা সনাতন। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা স্বপ্রকাশ, যেহেতু তাকে কেউ প্রকাশ করে নি; তার কোন কারণ নেই। আত্মা প্রকৃতির ন্যায় নিত্য বা শাশ্বত, যেহেতু আত্মার উৎপত্তি নেই, আর বিনাশও নেই। আত্মা জড় নয়, তবে জড়ের প্রকাশক। প্রকৃতির বিকার আছে, যেহেতু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা নির্বিকার, যেহেতু তার কোন পরিবর্তন নেই। আত্মা সৃষ্টিও নয়, স্রষ্টাও নয়। প্রকৃতি দৃশ্য, আর আত্মা প্রকৃতিজাত দ্রব্যের স্রষ্টা।

---

[35] অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম।
অপরস্পরস্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥—শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৬।৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলছে,—“এই আত্মা জন্মেও না মরেও না; এই আত্মা কোন কিছু হতে হয় নাই, কোন কিছুও ইহা হতে হয় নাই। এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত (অপরিবর্তনীয়), পুরাণ (চিরবিদ্যমান)। দেহ নিহত হইলেও এই আত্মা হত হয় না।”[36]

“জীবাত্মা লৌহকণ্টকের অগ্রভাগের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র।”[37]

শ্রুতিটি উপমার্থে, সুক্ষ্মতা বুঝাতেই যে ব্যবহৃত হয়েছে আশাকরি পাঠককে ব্যাখ্যা করতে হবে না। তারপরও এটি যে উপমার্থ হিসেবে বলা হয়েছে, পরবর্তী শ্রুতিতেই প্রমাণ পাব।

“একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করে তার একটি ভাগকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করলে যে সূক্ষ্ম পরিমাণ হয় জীবাত্মাও সেরূপ।”[38]
এখানেও উপমা হিসেবে জীবাত্মাকে অতিসূক্ষ্ম বলা হয়েছে। মূল শ্রুতিতে “কল্পিতস্য” উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, কল্পনা করার কথাই বলা হয়েছে।

এই ক্ষুদ্র আত্মা প্রাণীর মস্তিষ্কে অবস্থান করে সমগ্র দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্দ্রিয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের, স্মৃতির, জ্ঞানের প্রভৃতির সংযোগ ঘটায়, সমন্বয় করে, নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ আত্মা মস্তিষ্কেরও মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কে অবস্থিত জীব মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে সংযুক্ত হয়ে জ্ঞান-তন্তু, যা মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে পঞ্চাঙ্গুলের নখাগ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, তার দ্বারা এক দেশে অবস্থিত সর্ব শরীরান্তর্গত সুখ-দুঃখের অনুভূতি অনুভব করে থাকে। পক্ষাঘাত আদি রোগসমূহ দ্বারা যখন স্নায়ু এবং জ্ঞান-তন্তু বিকৃত হয়ে যায়, তখন শরীরে সুঁই প্রবেশের পরও আত্মার দুঃখ হয় না; কেননা সেই স্থানে অবস্থিত জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সর্বশরীরে চেতনার উপলব্ধি হেতু অনেক বিদ্বান আত্মাকে সর্বশরীর ব্যাপী মেনে থাকেন। কিন্তু তা ভ্রমপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেননা

---

36 ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।২০

37 আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোপি দৃষ্টঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৫।৮

38 বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৫।৯

এমনটা গ্রহণ করলে ক্ষুদ্র পক্ষী এবং হস্তীর শরীরে অবস্থিত আত্মার পরিধি সংকোচ এবং বিস্তার মানতে হবে। সংকোচ এবং বিস্তার মানার দরূণ জীবাত্মাতে বিকার এবং অনিত্যতা দোষ উৎপন্ন হবে।

জীবাত্মা শরীরের একস্থানে অবস্থান করেও কীভাবে শরীরান্তর্গত সকল সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রাপ্ত করে?

"হে সৌম্য, এই বিশাল বৃক্ষের মূলে যদি কেহ আঘাত করে, তবে সে বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ তাহার মাঝখানে আঘাত করে, তখনও সে বাচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ তাহার মাথার দিকে আঘাত করে, তবেও সে বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জীবাত্মা কর্তৃক অনুব্যাপ্ত হইয়া অবিরাম রসপান করিয়া সানন্দে অবস্থান করে। যদি জীব এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শাখা শুকাইয়া যায়; যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে, তবে দ্বিতীয় শাখাও শুকাইয়া যায়, তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করিলে তাহাও শুকায় এবং যদি সমস্ত বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, তবে সমস্তটিই শুকাইয়া যায়।"[39]

ছান্দোগ্যের এই শ্রুতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। মানুষ যখন আহত হয়, বা কোনো কারণে অঙ্গহানি ঘটে, তখনও সে ঐ বিশেষ অঙ্গ ছাড়াও জীবিত থাকতে পারে।

দুর্ঘটনায় বা অন্য কারণে কারও একটি হাত পুরোপুরি অকেজো হলে বা কেটে ফেলতে হলে, হাত ছাড়াও সে জীবিত থাকতে পারে। অথবা কেউ কেউ দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি ছাড়াও জীবিত রয়েছেন। কারণ জীবাত্মা আমাদের দেহে অবস্থান করছেন, এই জীবাত্মাই আমাদের জীবনের কারণ। এই জীবাত্মাই একজায়গায় অবস্থান করেও সর্বদেহের সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে।

যেরূপ গৃহকোণে অবস্থিত একটি প্রদীপ সমস্ত গৃহকেই আলোকিত করে, সেরূপ আত্মাও দেহের এক অংশে অবস্থান করেও তাঁর বিজ্ঞানময়তা প্রভৃতি গুণ,

---

[39] অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোহগ্রেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মানানু প্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠিতি ॥ ১
অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতি ॥ ২ ॥—ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।১১।১-২

যেগুলো সর্বদেহেই সঞ্চারিত, তার দ্বারা সর্বদেহব্যাপী সুখ-দুঃখদিকে অনুভব করতে পারে।

পুষ্পের গন্ধ যেমন পুষ্পে অবস্থান করেও তাকে অতিক্রম করে চারপাশের স্থানকে গন্ধময় করে, সেরূপ জীবাত্মাও বিজ্ঞানময়তা আত্মাকে অতিক্রম করে শরীরের সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়।

জীবাত্মার অমরত্ব প্রমাণ

এবারে আমরা জীবাত্মার অমরত্ব বিষয়ে আলোচনা করব। যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে জীবাত্মা অমর কি না,—এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে প্রবুদ্ধ হব। প্রথমে আত্মার অমরতার স্বপক্ষে যুক্তিগুলো দেখে নেয়া যাক্।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা জানতে পেরেছি শক্তির নিত্যতা নীতি অনুসারে শক্তি কখনও ধ্বংস হয় না। শুধুমাত্র শক্তির নিত্যতার রূপান্তর সম্ভব। যান্ত্রিকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে, আবার রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তরে শক্তির কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। শক্তির নিত্যতার সঙ্গে তুলনা করে আত্মাকেও নিত্য মনে করা যেতে পারে। শক্তির যেমন বিনাশ নেই, আত্মারও তেমনি বিনাশ নেই। সুতরাং আত্মা অমর।

মানুষের ধী-শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তার চিন্তন, স্মৃতি এবং কল্পনা দেশকালের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। অর্থাৎ কিনা, মানুষের ধী-শক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রিয়া করতে পারে। প্রত্যয় বা সার্বিক ধারণার মাধ্যমেই চিন্তন ক্রিয়া করে। চিন্তন দেশকালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। স্মৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্তুর অনুপস্থিতিতেই বস্তুর জ্ঞান হয়। কল্পনার ক্ষেত্রে সহজেই দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করা যায়। ধী-শক্তি আত্মারই শক্তি। ধী-শক্তি যদি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ক্রিয়া করতে পারে, আত্মার পক্ষেও জাগতিক বন্ধন অর্থাৎ দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অস্তিত্বশীল থাকা সম্ভব। তাই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা বিনষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আত্মাকে অমর বলতে হয়।

তত্ত্ববিজ্ঞানে আত্মার অমরতা সম্পর্কে অনেক যুক্তি দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিকের অভিমত আলোচনা করব।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আত্মা অমরতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। সেই যুক্তিগুলো কি কি?

প্রথমতঃ, আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য, যেহেতু আত্মা সরল ও অযৌগিক দ্রব্য। কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্যই যৌগিক হতে পারে না। যা যৌগিক তা বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। কিন্তু যা অযৌগিক তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। যা বিশ্লিষ্ট হতে পারে না তার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই। কাজেই আত্মারও ধ্বংস নেই, সুতরাং আত্মা অমর।

দ্বিতীয়তঃ প্লেটো মনে করতেন যে, সৎ এর সঙ্গে অসৎ এর পার্থক্য আছে এবং ধারণার বা প্রত্যয়ের জগতের সঙ্গে পরিবর্তনশীল দৃশ্যমান জগতের পার্থক্য আছে। তাঁর মতে আত্মা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী। আত্মার সঙ্গে অন্তহীন ধারণার জগতের সম্বন্ধ আছে। কারণ আত্মা প্রজ্ঞার অধিকারী। আত্মার বৌদ্ধিক প্রকৃতি আছে। আবার পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গেও এর সম্পর্ক আছে। কারণ দেহরূপ আধারের মধ্যে আত্মার মূর্ত অস্তিত্ব আছে।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়। প্রকৃত জ্ঞান শাশ্বত। আত্মা শাশ্বত জ্ঞানের আধার, তাই অবিনশ্বর। যদিও দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মতই পরিবর্তনশীল এবং অস্থায়ী; বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা অপরিবর্তনীয় সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অপরিবর্তনীয় সত্তার সম্পর্কে আমরা অবহিত হই যখন আমরা বিশেষ বিশেষ কল্যাণময় বস্তুর কথা চিন্তা করি না, কল্যাণেরই কথা চিন্তা করি; বিশেষ বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ক্রিয়ার কথা চিন্তা করি না, ন্যায়পরায়ণতার কথাই চিন্তা করি। এছাড়াও আমরা অন্যান্য সামান্য (universals) বা শাশ্বত ধারণার কথা চিন্তা করি, যে ধারণাগুলোর জন্য জাগতিক বস্তু এবং ঘটনা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাজেই পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়ের জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে উচ্চতর এবং স্থায়ী জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়াতে আত্মা অমর। সুতরাং কোন ব্যক্তি দেহের পরিবর্তনশীল কামনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে যদি শাশ্বত সত্তার চিন্তনে নিজেকে ব্রতী করে,

তাহলে সেই ব্যক্তি দেখতে পাবে যে মৃত্যুতে তার দেহ ধূলায় পরিণত হলেও, তার আত্মা অবিনশ্বর অপরিবর্তনশীল রাজ্যে বিচরণ করবে। যে বুদ্ধি শাশ্বত সত্যকে জানে তাও শাশ্বত। শাশ্বত বুদ্ধির ধারক আত্মা অবশ্যই অমর।

দেকার্তের অভিমত—আধুনিক দর্শনে দেকার্ত প্লেটোর এই যুক্তিকেই অন্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনিও আত্মাকে এক সরল, অবিনশ্বর এবং অজড় দ্রব্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধ চেতনাই আত্মার স্বরূপ। যেহেতু চৈতন্য আত্মার স্বরূপ, সেহেতু চৈতন্যের কোন বিনাশ নেই। জগতের কোন আত্মাই ধ্বংস হতে পারে না। যদি হয় তবে নিত্যতার নীতির বিরোধিতা করা হবে। কাজেই আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে অস্থিতিশীল থাকবে। অর্থাৎ দেকার্তের মতেও আত্মা অমর।

পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট নৈতিক জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার অমরতাকে স্বীকার কবে নিয়েছেন। অমরতা সম্বন্ধে কান্টের প্রমাণ দর্শনের ইতিহাসে নৈতিক প্রমাণ নামে পরিচিত। এই প্রমাণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রমাণের দুটি দিক আছে।

প্রথমতঃ, ন্যায় বিচার আত্মার অমরতার নির্দেশ করে। এই জীবনে সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হন না। কিন্তু ন্যায় বিচার দাবী করে যে, সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হবে এবং অসৎ ব্যক্তি তার অসততার জন্য শাস্তি পাবে। তা না হলে নৈতিকতার কোন তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি না যে সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হচ্ছেন। তাই কোন ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়, যে জীবনে সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হবেন। সুতরাং ন্যায়বিচারের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়।

যুক্তিটির অন্য দিক হল, নৈতিক জীবন হল এমন এক আদর্শের জন্য সংগ্রাম, যে আদর্শ আমরা এই জীবনেই লাভ করতে পারি না—এই আদর্শ হল পূর্ণ সততার আদর্শ। এই আদর্শ যদি কখনই লাভ করা না যায় তাহলে নৈতিকতার আদর্শ হয়ে পড়ে এক অলীক বস্তু। আর নৈতিক আদর্শ যদি সত্য হয় তাহলে নৈতিক কর্মকর্তার মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকবে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়। অর্থাৎ কিনা, নৈতিক আদর্শের বাস্তবতা প্রতিপাদনের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার। কান্টের

ভাষায় "নৈতিক প্রচেষ্টা হল সিদ্ধির নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অগ্রগতি। সততাকে লাভ করার বিরামবিহীন প্রচেষ্টা। এই অন্তহীন অগ্রগতি সম্ভব হয় যদি আমরা পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেই যে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে এবং এই সমগ্র সময় জুড়ে সে তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। আত্মার অমরতা বলতে আমরা এটাই বুঝি। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভব, কেবল মাত্র যদি আমরা আত্মার অমরতাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিই।"

আত্মা অবিনশ্বর, তাহার বিনাশ নাই। আত্মা নিত্য, অবিনশ্বর আত্মা নিহত হন না। আত্মা জন্মায় না, মরেও না, আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ (অনাদি)। আত্মা নিত্য, অবিনশ্বর, অজ ও অব্যয়। আত্মা পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে। আত্মাকে শস্ত্র কাটিতে পারে না, অগ্নি দাহ করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। আত্মা সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন। শরীরে অবস্থিত আত্মা সর্বদা অবধ্য অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না (শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২।১৭-২৪,৩০)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আত্মার অমরতা সিদ্ধ হল। এবার আত্মার মুক্তি প্রসঙ্গ।

যেখানে মুক্তির বিষয় উঠবে সেখানে বন্ধনও থাকবে। তাই মুক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বন্ধন বিষয়েরও আলোচনা করতে হয়। তাই এখন কেন বন্ধন হয় এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী,—সেবিষয়ে আলোচনা করা যাক্।

পুরুষ বা আত্মার বন্ধন ও মুক্তি

পুরুষ বা আত্মা স্বরূপত মুক্ত ও নিত্য। এটি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রভাবে পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে। ফলে সুখ-দুঃখাদি,—যা মনেরই বৃত্তি, তাদের পুরুষ নিজের বলে মনে করে। পুরুষ বা আত্মার এই অবস্থার নামই বন্ধন। আত্মা যে অনাত্মা বা দেহ প্রভৃতি হতে পৃথক, এটি বুঝতে না পারাকে 'অবিবেক বা

অবিদ্যা' বলা হয়। এই অবিবেক বা "জ্ঞানের অভাবই বন্ধনের কারণ।"[40] জগতে সুখের অস্তিত্ব থাকলেও সুখের তুলনায় দুঃখ অনেক বেশি। দুঃখ প্রধানত ত্রিবিধ। যথা—

১। আধ্যাত্মিক (অবিদ্যাজনিত ইন্দ্রিয় বিকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও ঈর্ষাদি দোষের সম্বন্ধ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, জ্বরাদি ব্যাধি হতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, আত্মীয় স্বজনের অভাবে মোহজনিত শোকগ্রস্ত হয়ে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় ও দরিদ্রাদি জনিত মনোকষ্টের দ্বারা যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়)।

২। আধিভৌতিক (দস্যু, তস্কর ও সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণের দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়)।

৩। আধিভৌতিক (বজ্রপতন, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন, গৃহপতন, বৃক্ষ হতে পতন, শিলাপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাক বশতঃ যে দুঃখ উৎপন্ন হয়)।

এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ বা মুক্তি। প্রত্যেক মানুষই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। এখানে একটা প্রশ্ন অবতরণ করা যেতে পারে। প্রশ্নটি এই—মোক্ষ বা মুক্তি কি কোনরূপ সুখ বা আনন্দের অনুভূতির অবস্থা? কেননা, সুখ এবং দুঃখ আপেক্ষিক শব্দ, যেখানে দুঃখ নেই সেখানে সুখ বা আনন্দ থাকবে কীভাবে?

সবার আগে জানতে হবে দুঃখ কি! দুঃখের কারণ কি!

কঠোপনিষদের যম নচিকেতা উপাখ্যানে আমরা দেখতে পাই, নচিকেতা যখন যমাচার্যের নিকট তৃতীয় বরে ব্রহ্মকে জানতে চাইলেন, তখন যমাচার্য তার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারিত্ব পরীক্ষা করার জন্য তাকে বললেন—"তুমি জাগতিক যেকোনো সম্পদ, ধন-দৌলত চাইলে আমি তা তোমার জন্য উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান সহজ নয় (১।১।২৩-২৪)।" এসময় নচিকেতা বলেন—"যে জগৎ স্থায়ী নয়, সেই ক্ষণস্থায়ী জাগতিক বস্তু দিয়ে আমি কী করব? (১।১।২৬)"

[40] বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ—সাংখ্য দর্শন ৩।২৪

নচিকেতার মতে,—"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো" অর্থাৎ, মনুষ্য কখনো ভোগ দ্বারা বা ধন দ্বারা তৃপ্ত হয় না (১।১।২৭)।

আপনি যদি ক্ষুধার্ত থাকেন, হয়ত আপনার কাছে মনে হতে পারে আপনি দুঃখিত। খাবার পেলেই আপনার আনন্দ। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে পঞ্চাশজন লোকের আহার সমতুল্য খাবার রাখলে, সে নিজের প্রয়োজনমতই আহার করবে। নিজের উদর পুর্তি হয়ে গেলে তার সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান খাবার রাখলেও সে আহার করতে পারবে না। অতএব, আহার কখনোই মনুষ্যের পরম আনন্দের কারণ নয়। ঠিক একইভাবে, সকল জাগতিক ভোগ্যবস্তুই একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমাদের আনন্দ দেয়, আমাদের পরম আনন্দ দেয়ার ক্ষমতা কোনো জাগতিক বস্তুর নেই।

এজন্যই মনু মহারাজ বলেছেন—"কামনার ভোগ দ্বারা কখনো কামনার নিবৃত্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিলে যেমন অগ্নি নির্বাপিত হয় না, বরং আরো প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে; সেরূপ ভোগ দ্বারাও কামের বৃদ্ধি হয়।"[41]

মহারাজ ভর্তৃহরি বলেছেন—"'ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ'—ভোগের উপভোগ করলে কখনও ভোগ সমাপ্তি হয় না, বরং আমরাই সমাপ্ত হয়ে যাই।"

তাহলে **দুঃখের পরম কারণ কী?** সহজভাবে বললে দুঃখের পরম কারণ হল অবিদ্যা। "অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মভাব এর জ্ঞান হল অবিদ্যা।"[42]

সুতরাং, সারকথা এই যে, বস্তু যেমন না, তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণাই হল অবিদ্যা।

অবিদ্যা কিরূপে দুঃখের কারণ?

যে পুরুষ (ভোক্তা জীব) এক দেহ-বৃক্ষে আসক্ত হয়ে নিজেকে শক্তিহীন মনে করে মোহগ্রস্ত হয়ে শোকদুঃখ ভোগ করে। সেই জীব যখন যোগীদের সেবিত,

---

[41] ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥—মনুসংহিতা ২।৯৪

[42] "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা॥—যোগদর্শন, সাধনপাদ, সূত্র ৫

দেহ থেকে ভিন্ন, অপর ঈশ্বরকে এবং তাঁর মহিমাকে দর্শন করে তখন সে বিগতশোক হয়।[43]

একই বৃক্ষে থাকা দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা হল জগৎ উপভোগকারী। এই জীবাত্মা জগৎ সংসারে থাকা সকল বস্তুকে পরম মনে করে এবং জাগতিক সুখকেই জীবনের সাধ্য মনে করে, জাগতিক ভোগের পূর্তিতেই মনোযোগ দেয়। কিন্তু ভোগ দ্বারা কখনই তার জাগতিক সুখ লাভ হয় না, ভোগ করতে করতে ভোগের নিবৃত্তি হয় না, বরং ব্যক্তি আরও অধিকতর ভোগবিলাসের দুনিয়ায় প্রবেশ করে ও ভোগের চিন্তাতেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। এর ফলে এই জন্মে তার ভোগ হ্রাস হয় না, বরং এই কর্মের ফল ভোগ করতে পুণরায় তাকে আবার জন্মাতে হয়।

এই যে অস্থায়ী ও অনিত্য এবং সদা গতিশীল তথা পরিবর্তনশীল জগতকে[44] নিত্য মনে করার কারণে হওয়া অবিদ্যায় জীবের মুক্তি হয় না।

মহর্ষি কপিল বলছেন—"এই সংসারে কেহ কোনদিন সুখী হইতে পারে নাই, কারণ এই স্থূল শরীরই ত্রিবিধ দুঃখের কারণ।"[45]

এই ত্রিবিধ দুঃখগুলো কি কি, তা আমরা পূর্বে জেনেছি। উপরোক্ত দুঃখগুলো থেকে মুক্তি লাভের উপায় হল ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থূল শরীরই দুঃখের কারণ, জীবাত্মার স্বরূপত কোন শরীর নেই। শরীর না থাকার কারণে দুঃখও সম্ভবপর নয়। মুক্তিপ্রাপ্ত হলে জীবাত্মা নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে,—যেটি তার দুঃখরহিত অবস্থা। সুতরাং জীবাত্মা মোক্ষাবস্থায় দুঃখরহিত বা আনন্দময়।

আনন্দময় ঈশ্বরই সকল আনন্দের প্রতিষ্ঠা। এরূপ ঈশ্বরকে যিনি অসৎ বা অবিদ্যমান বলে জানেন তিনি নিজেও অসৎ হয়ে পড়েন। পরন্তু যিনি জগতের

---

43 সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং য়দা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।২

44 যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— ঈশোপনিষদ ১

45 কুত্রাপি কোঽপিসুখখীতি।—সাংখ্য দর্শন ৬।৭

প্রতিষ্ঠা স্বরূপ ঈশ্বর আছেন—এরূপ জানেন, তিনি ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠা তথা মোক্ষলাভ করেন। কারণ, তখন তিনি আনন্দময় ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ অবগত হন। আর আনন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে তিনিও স্বয়ং আনন্দময় হয়ে যান,—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।

এস্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হতে পারে যে, শরীরই যখন সমস্ত দুঃখের কারণ, তখন শরীরকে নাশ করা বা আত্মহননের পথ বেছে নেয়াই যুক্তিযুক্ত! শরীর না থাকলে দুঃখ আসবে না,—না থাকবে বাঁশ আর না বাজবে বাশি!

কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, আত্মহননে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, বরং পরলোকে তদপেক্ষা অধিক দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়। কারণ আমরা পূর্বে জেনেছি আত্মার নাশ হয় না, তা অনাদি; নাশ হয় শুধুমাত্র স্থূল শরীরের। এই জীবনকে নিজেই বিনাশ করে, পারলৌকিক জীবন বা পরবর্তী জন্ম সুখের হবে না। পারলৌকিক জীবন সুখের করতে হলে, এই পৃথিবীতে চরিত্রবান, সহনশীল, স্বচ্ছ মনোবৃত্তি ধারণ করে ত্যাগ ও ধৈর্য্যের দ্বারা অশুভ পথ ত্যাগ করে, প্রকৃতির নিয়মে যথাকালে দেহত্যাগ করতে হবে। জীবনের ক্রমোন্নতির জন্য আমাদের এই পার্থিব জীবনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আত্মঘাতী হলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

আমাদের এই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ তথা মোক্ষপ্রাপ্ত করা এবং সেজন্য আমাদের সবসময় প্রযত্ন করা উচিত। কোনো দুঃখে বিহ্বল হয়ে বা শরীর দুঃখের কারণ, এই ভেবে আত্মহননের পথ বেছে নিলে জীবনের উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। আত্মহননে দুঃখের লাঘব ত হয়ই না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত পাপের স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বদিকে গমন করে, যার পরিণাম অধোগতি/নিকৃষ্ট যোনী।

নিজের উন্নতির কামনা প্রত্যেক মানুষই করে। যদি কোনো দুঃখে বিহ্বল হয়ে নিজের আত্মহননের ইচ্ছাই আসে তবে উন্নতি হবে কীভাবে? তাই ধৈর্য অবলম্বন করে, যতটুকু সম্ভব উন্নতির জন্য প্রযন্ত করা উচিত। আমাদের জীবন নিঃশেষ হওয়ার জন্য নয়, বরং "উত্তমোত্তম কর্ম করতে করতে শত বর্ষ বা তার অধিক বেঁচে থাকার প্রেরণা, তবেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।"[46]

---

[46] যজুর্বেদ ভাবার্থ ৪০।২

আত্মহনন করে শরীরকে না হয় বিনষ্ট করা যায়, কিন্তু নিজ হৃদাকাশের আত্মাকে? তাকে কীভাবে বিনষ্ট করা যাবে? তার ত জন্ম-মৃত্যু, নতুন-পুরাতন বলে কিছু নেই, তিনি সর্বদা একরস। অগ্নি দ্বারা না তাকে দাহ করা যায়, জল দ্বারা না তাকে ভেজানো যায়, শস্ত্র দ্বারা না তাকে ছেদন করা যায়। কর্ম এই পার্থিব শরীরের নয়, আত্মার। সুতরাং পার্থিব শরীরকে বিনষ্ট করে আত্মাকে কর্মত্ব থেকে রোধ করা যাবে না। শরীরস্থ আত্মাকে জানতে হবে, যে ব্যক্তি আত্মাকে জেনেছে, সে আত্মহননের পথ বেছে নেবে না। তাই নিজ শরীরকে ধ্বংস না করে তাকেই ধ্বংস করা উচিত, যা শরীরকে দুঃখ প্রদান করে।

মানবের পরমায়ু অনন্তকালের নিকট অতি অল্প। এই স্থূল জগতে আত্মোন্নতি ও জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অতি অল্পকালের জন্য আমরা পার্থিব দেহ প্রাপ্ত করি। তাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করে জীবনের পরম কর্তব্য সাধন করতে হবে। আমাদের জানা উচিত দুর্বল নিদ্রিত বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে ক্রমে উদ্‌বুদ্ধ করতে বহুকাল ও বহু জন্ম অতীত হয়। আচ্ছন্ন আমাদেরকে জীবিত থেকেই পার্থিব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যতদূর সম্ভব ধৈর্য অবলম্বন করে, জ্ঞান বা আত্মোন্নতির বিকাশ সাধন করতে হবে। নচেৎ এই কল্যাণময়ী আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি যেসকল জীবের ভিতর বর্তমান, তাকে মানুষ অবহেলা করে আত্মহত্যাকে প্রশ্রয় দিলে, মানবতার মহীয়সী অবস্থায় উপনীত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। সন্নিপাতগ্রস্ত ব্যক্তির বুঝা উচিত, প্রতিদিনই উদয়ান্তের চক্রে পড়ে পরমায়ু ক্ষয় হচ্ছে; আবার আত্মঘাতী হওয়ার নিকৃষ্ট ইচ্ছা কেন!

বিচার করলে বোধ হয় যে, আত্মহননকারীর কর্ম তার নিজ শরীরের ওপর জিঘাংসা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। হত্যাকারী, হস্তমূর্খ, হিংসুক কোন জীবনেই শান্তি পায় না। এজন্যই বেদ বলছে,—“যে সকল মনুষ্য অজ্ঞানের আবরণ দ্বারা সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত এবং যে সকল মনুষ্য আত্মহননকারী, তাহারা নিজের প্রাণপোষণে তৎপর অবিদ্যা আদি দোষযুক্ত মনুষ্যের মত পাপকর্মকারীরূপে প্রসিদ্ধ। তাহারা মৃত্যুর পর পরজন্মে এবং জীবিত অবস্থাতেও সেই দুঃখ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারযুক্ত ভোগসমূহকে প্রাপ্ত হয়।”[47]

[47] অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

অর্থাৎ যেসব মানুষ অন্ধকাররূপ অজ্ঞান আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং আত্মার বিরুদ্ধ আচরণকারী, তারাই "আত্মহন্তা" হয়। এরকম ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর পরজন্মে সেই অজ্ঞানরূপ দুঃখ ও অন্ধকারযুক্ত ভোগসমূহকেই প্রাপ্ত হয়।

এছাড়া শরীরকে ধ্বংস করে অন্তরের কি বা লাঘব করা যায়? জড়াতিরিক্ত আত্মা এই পার্থিব শরীর ত্যাগ করে পরলোকগত শরীরে ঠিক অনুরূপ ভাবনা নিয়েই কার্য করে। কারণ "মৃত্যুর সময় আত্মা তার জ্ঞান, কর্ম এবং পূর্বজন্মের সংস্কার সমূহকে ধারণ করে স্থূল শরীর ত্যাগ করে।"

সুতরাং ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা ও দুঃখে, শান্তি পাওয়ার বাসনায় অকাল-মৃত্যুকে বরণ করে, এই স্থূল পার্থিব শরীরের অবসানান্তরে, সুক্ষ্ম শরীরে পরলোকে গিয়ে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। আত্মার সম্বন্ধ শরীরের সাথে হয়, তা স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম হোক,—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নৈরাশ্যের অনুভূতি 'আত্মার'।

আত্মঘাতীর মলিন জঘন্য চিত্তবৃত্তি তাকে সুখ শান্তির অভাববশতঃ দারুণ দুঃখ প্রাপ্তি করিয়ে থাকে। যারা সৎপ্রবৃত্তিতে জীবনধারণ করে যথাকালে দেহত্যাগ করেন, তাঁরা পরজন্মে অল্প বিস্তর সুখ বা আনন্দ পাবেনই। কিন্তু সেখানে আত্মঘাতীর দুষ্কৃত কর্ম্মের পুরষ্ক্রিয়া মাত্র সন্তপ্ত দশা, অতি বেদনাদায়ক।

এই সংসারে নিজ অস্তিত্বের অনুপযোগী জীবনের প্রতিকূল ব্যবস্থা করতে উদ্যত হলে, তা অব্যবস্থা হবে। কোন কর্মের ফলবশতঃ আমরা ইহলোকে জন্মগ্রহণ করি; আত্মহত্যা যারা করেন, তারা বুদ্ধি বৈকল্যাবস্থায় একে বোধের মধ্যে আনতে অক্ষম। এই অক্ষমতার জন্য যে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, তাতে বিকার উপস্থিত হয়। এই বিকার অবস্থায়ই তারা আত্মহত্যা করেন। এর পরিণাম পরজন্মে নিদারুণ কষ্ট ভোগ। পরাশর সংহিতা (৪।১) বলছে—"যে ব্যক্তি ক্রোধে বা ভয়ে বা অহংকারের বশবর্তী হইয়া আত্মহত্যা করে, সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী, তাহার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবার গতি হয়।"

তাই ঈশ্বরের নিকট এরূপ প্রার্থনা করা উচিত, হে ঈশ্বর! আমাকে শতবর্ষ বা ততোধিক বেঁচে থাকার প্রেরণা দান কর। যদ্বারা আমি তোমার স্বরূপকে যথার্থরূপ

তাংস্তে প্রেত্যাপি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥—যজুর্বেদ ৪০।৩

জেনে তোমাকে উপাসনা ও ভক্তি দ্বারা স্তুতি করতে পারি। হে পরমাত্মা! আমি যেন মোক্ষমার্গে অগ্রসর হতে পারি।

এবারে মোক্ষ বা মুক্তি প্রসঙ্গ।

আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় হতে যে ভিন্ন, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে না পারলে জীবাত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণের অর্থ হল, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করা। মননের অর্থ হল, বিচারপূর্বক শাস্ত্রবাক্যের অর্থ বুঝে নিয়ে তাকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর নিদিধ্যাসনের অর্থ হল, যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপকে ধ্যান করা। এই ধ্যানের দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত শুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি ঘটে এবং অবিদ্যা দূর হয়। জীব তখন আর এই কথা বলে না যে, আত্মা দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে মিথ্যাজ্ঞান থেকে উদ্ভূত রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষ দূরীভূত হয়; ফলে প্রবৃত্তির অবসান ঘটে। প্রবৃত্তির অভাবে জীবের পুনর্জন্ম হয় না। জন্ম নিরোধ হলেই আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগের কোন প্রশ্ন উঠে না। আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগ না ঘটলে দুঃখেরও কোন প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে এবং জীব মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই, তিনি সন্ন্যাসীই হোন বা গৃহস্থই হোন, মুক্তিলাভের অধিকারী।

প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকাশ অর্থাৎ প্রকৃতিজাত স্থূল পদার্থ, এবং পুরুষ; এই তিনের সম্যক জ্ঞান হতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান (অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি থেকে ভিন্ন এই জ্ঞান) জন্মে। ভেদজ্ঞানের অপর নামই বিবেকজ্ঞান। আলোকের উপস্থিতিতে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি জীবের বিবেক জ্ঞান জন্মিলে তার অবিদ্যা দূরীভূত হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

এখন প্রশ্ন, **বিবেকজ্ঞান কিভাবে লাভ করা যায়?**

বিবেকজ্ঞান তত্ত্ব সম্পর্কে ঔপপত্তিক জ্ঞান (অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন বা গ্রন্থাদি দ্বারা প্রামাণ্য জ্ঞান) নয়। জ্ঞান তত্ত্ব সাক্ষাৎকারজাত জ্ঞান (অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা যে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত যাবতীয় বস্তু থেকে ভিন্ন,—এই সত্য সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি)।

"যেমন রামচন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠের তত্ত্বোপদেশের দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদানুকূল কর্তব্য পালন ও যম নিয়মাদি সাধন করিতে করিতে একনিষ্ঠ হইয়া তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।"[48]

"মুঞ্চন্তি পৃথগভবন্তি জনা যস্যাং সা মুক্তিঃ" অর্থাৎ যাহা থেকে মুক্ত হওয়া তাহার নাম মুক্তি। এখন প্রশ্ন যে, কি হতে মুক্ত হওয়া যায়? এ প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে মহর্ষি গৌতম বলেছেন—"দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হওয়ার পর তাহার অন্তরের অব্যবহিত পূর্বের নাশ হওয়ার দ্বারা মোক্ষ হয়।"[49]

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমাত্মার নিত্য যোগ দ্বারা সদাকালের জন্য যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম মোক্ষ;—অর্থাৎ তাহাকেই মোক্ষ বলে।[50]

যখন জীবের অবিদ্যাদি ক্লেশ দূরীভূত হইয়া গিয়া বিদ্যাদি শুভগুণের প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন।[51]

যে মনুষ্য স্বরূপকে বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে একসঙ্গে জানিতে পারে সে অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মোপসনা দ্বারা মৃত্যু হতে উদ্ধার পাইয়া বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।[52]

যখন মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পরমেশ্বরে স্থির হইয়া যায় ও তাহাতেই সদা রমণ করিতে থাকে এবং যখন জীবের বুদ্ধি জ্ঞানের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে, অর্থাৎ একমত হইয়া যায়, সেই অবস্থাকেই পরমগতি বা মোক্ষ বলে।[53]

---

48 রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ।—সাংখ্য দর্শন ৪।১

49 ন্যায় দর্শন ১।১।১

50 তদত্যন্তবিমোক্ষঽপবর্গঃ।—ন্যায় দর্শন ১।১।২২

51 তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।—যোগদর্শন, সাধনপাদ, সুত্র ২৫

52 সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেব মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥—যজুর্বেদ ৪০।১৪

53 যদা পঞ্চবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিং॥—কঠোপনিষদ ২।৩।১০

যখন জীবের অবিদ্যাদি বন্ধনের গ্রন্থি সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, তখনই তিনি মোক্ষ বা মুক্তিপ্রাপ্ত হন। হহাই বেদশাস্ত্রের উপদেশ।[54]

আত্মার মুক্তি আসলে নূতন জিনিস নয়। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা মুক্তি। আত্মা স্বরূপে অবস্থান করলে তাতে আর কোন নূতন গুণের উদ্ভব হয় না। পুরুষ বা আত্মার মুক্ত অবস্থাকে কৈবল্যও বলা হয়, যেহেতু পুরুষ তখন কেবল ভাবে অবস্থান করে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যিনি ভোগী, তিনি কী মুক্তিলাভ করতে পারবেন? ভোগ মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না, এজন্য কী সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করা উচিত?

মোক্ষপ্রাপ্তির পথে ভোগ বাঁধা প্রদান করে কেন?

জীবাত্মার ভোগের জন্যই এই সৃষ্টি। তবে প্রয়োজনানুযায়ী ভোগ মোক্ষের বাধক হয় না। সমস্যা তখনই হয় যখন আমরা প্রয়োজনের অধিক ভোগ করার চেষ্টায় নিয়ত থাকি। এব্যাপারে কিছুক্ষণ পরে বলি, তার আগে চলুন—গল্প শুনে আসি, উপনিষদের গল্প।

গল্পটি কঠোপনিষদের নচিকেতার।[55] নচিকেতা তখন বয়সে নবীন। তাঁর পিতার নাম ছিল বাজশ্রবস। বাজশ্রবস একবার যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক গাভী দান করতে আরম্ভ করলেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় যেমন হয়ে থাকে, দানের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যয় সংকোচের ইচ্ছার সংঘর্ষ ঘটল। তিনি বেছে বেছে দুগ্ধহীন, বৃদ্ধ গাভীগুলিকে দান করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পিতার কাণ্ড দেখে নচিকেতার বিবেক দংশন করল। তিনি ভাবলেন এই কাজ ত ভাল নয়, এরূপ গাভী দান করে পিতার স্বর্গলাভ ত হবেই না বরং তিনি দুঃখবহুল লোকে গমন করবেন। তাই পিতার অনিষ্ট আশঙ্কা করে তাঁকে বললেন, আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে দান করবেন?

---

[54] যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥—কঠোপনিষদ ২।৩।১৫

[55] কঠোপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম বল্লী।

পিতা উত্তর দেন না। একবার, দুবার, তিনবার নচিকেতা প্রশ্ন করলেন। পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন—"তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করলাম।"

পিতার নিকট থেকে যমালয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়ে নচিকেতা ভাবলেন,—পিতা নিশ্চয়ই আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন; কিন্তু তাঁর ক্রোধের কারণ কি? লোকে সাধারণত অশিষ্ট, অবাধ্য বা অযোগ্য পুত্র বা শিষ্যের উপরই ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে এবং অধম পুত্র বা শিষ্যকেই যমালয়ে যেতে বলে, কিন্তু আমি তো পিতার বহু শিষ্য বা পুত্রের মধ্যে গুরু-শুশ্রুষা ও শিষ্টাচারাদিতে সর্বোত্তম, অন্তত মধ্যম, কদাচ অধম নই। তবে পিতা আমাকে যমের বাড়ি পাঠাতে চান কেন? আমাকে দিয়ে যমের এমন কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? নিশ্চয়ই পিতা কোন প্রয়োজনের কথা না ভেবেই আমাকে যমালয়ে যেতে বললেন। যাইহোক, আমি পিতার বাক্য পালন করব।

এই প্রকার চিন্তা করার পর যমালয়ে যাওয়াতে পুত্রবিয়োগবশত পিতার মনে পাছে কোন দুঃখ হয় এবং সেইজন্য তাঁকে যেতে অনুমতি না দেন, এই ভেবে তিনি পিতাকে বললেন,—পিতা! আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিরূপ আচরণ করেছেন, বর্তমানকালে সাধুসজ্জন কিরূপ আচরণ করেন তা আলোচনা করলে দেখতে পাবেন যে, তাঁরা প্রিয়জনের বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হয়ে কখনও সত্যভঙ্গ করেন নি। কারণ এ সংসারে মানবজীবন অনিত্য। মানুষ শষ্যের ন্যায় বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। কাজেই মানবজীবনের অনিত্যতা স্মরণ করে পূর্বপুরুষ ও বর্তমান সাধুসজ্জনগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক আমার বিয়োগে শোক করবেন না, আমাকে যমালয়ে যেতে অনুমতি দিয়ে আপনার বাক্য প্রতিপালন করুন।

এরপর নচিকেতা যমের গৃহে উপস্থিত হলেন, কিন্তু যমের অনুপস্থিতির কারণে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে অপেক্ষা করলেন। তিন দিন পর যম এসে নচিকেতাকে নমস্কার ও পূজা করলেন। তারপর তিন দিন অভুক্ত হয়ে অপেক্ষা করার কারণে নচিকেতাকে তিনটি বর প্রার্থনা করতে বলেন।

নচিকেতা সম্মত হলেন। প্রথম বরে চাইলেন,—"পিতা তাঁর ওপর রাগ করে তাঁকে যমালয়ে প্রেরণ করে পিতার যে দুঃশ্চিন্তা হয়েছে তা প্রশমিত হোক। তাঁর

ওপর পিতার বিরক্তি চলে যায় এবং তিনি যেন মনে শান্তি পান। দ্বিতীয় বরে 'স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভুত অগ্নিবিদ্যা লাভের বর চাইলেন।"

এবার তৃতীয় বর চাওয়ার পালা। এই অপরিণত নবীন বালক এবার যে বর চাইলেন তা যমের ধারণারও অতীত, তা যমকে ভীষণ সমস্যার ফেলে দিল। নচিকেতা বললেন,—'আমি আত্মার স্বরূপ তথা আত্মতত্ত্ব জানতে চাই'।

নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কি না তা পরীক্ষা করার জন্য যম বললেন,—এই বিষয়টির কিছুমাত্র অংশও সুবিজ্ঞেয় নয়। নচিকেতা, তুমি অন্য বর চাও। আমাকে এ বিষয় অনুরোধ করো না। কিন্তু বালকটি বয়সে নবীন হলেও বুদ্ধিতে প্রবীণ। তিনি যমের মনের উক্তিকেই যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ করে বললেন, দেবতারাও এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং আপনি স্বয়ং বলছেন এটি সুবিজ্ঞেয় নয়। অপরপক্ষে এ বিষয়ে আপনার মত বক্তাও লাভ করা যাবে না। সুতরাং এর তুল্য আর কোনো বর হতে পারে না। যম নচিকেতাকে নিরস্ত করতে ভিন্ন পথ ধরলেন। তিনি বালকটিকে নানা লোভ দেখাতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন,—তোমার জন্য পরিপূর্ণ ভোগের ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত আছি। যে কামনাগুলো মর্ত্যলোকে দূর্লভ, একে একে তা প্রার্থনা কর, আমি পূরণ করব। শতায়ু পুত্র-পৌত্র তুমি নাও, বৃহৎ ভূমির অধীশ্বর তুমি হও, যতদিন চাও আয়ু প্রার্থনা কর, কিন্তু আত্মার বিষয় আমাকে তুমি প্রশ্ন করো না। এই লোভনীয় বস্তুর বিপুল তালিকাও নচিকেতার মন ভুলাতে পারল না।

যম তখন একবার শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন,—এই পৃথিবীতে যে সকল কাম্যপদার্থ অতি দুর্লভ সে সমস্ত তুমি ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। এই যে রথারূঢ় ও বাদ্যযন্ত্র-সমন্বিত রমণীসকল আছে, এদের মত রমণী লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার প্রদত্ত এই সকল রমণী দ্বারা তোমার সেবা-পরিচর্যা করাও। কিন্তু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করো না।

কিন্তু সে চেষ্টাও বৃথা হল। নচিকেতা বললেন,—হে যমরাজ, আপনি যে সকল ভোগ্যবস্তু আমাকে দিতে চান সমস্তই ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে, কাল থাকবে কিনা সন্দেহ। এরা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষয় করে। আর আপনি যে দীর্ঘজীবন আমাকে দিতে চান, তা অনন্তকালের তুলনায় নিতান্তই অল্প। অতএব এই রথ অশ্ব

প্রভৃতি বাহন নৃত্যগীত সমস্ত আপনারই থাকুক, আমি এদের কিছুই চাই না। বিত্ত বা ধন দ্বারা মানুষের তৃপ্তি হতে পারে না, বিশেষত আপনার স্বাক্ষাত যখন লাভ করেছি, তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করব। আর যতদিন আপনি যমরাজ্যে প্রভুপদে আসীন থাকবেন ততদিন আমরা নিশ্চয়ই জীবনধারণ করব। এর জন্য কোন বর প্রার্থনার দরকার নেই। কাজেই আত্মার তত্ত্ববিষয়ক বর'ই আমার প্রার্থনীয়।

জন্ম-মরণশীল মানুষ জরাব্যাধি শোক-দুঃখের অধীন। পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের বহু কষ্ট ভোগ করতে হয়। সংসারের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ অনিত্য। এসকল অনিত্য বস্তু দ্বারা নিত্য সুখ প্রাপ্ত করা যায় না। যেসকল অজ্ঞ লোক এই সংসারে সার পদার্থ জানে না তারাই এই সকল অনিত্য ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এসকল বস্তুর অনিত্যতা ও অসারতা সম্যক উপলব্ধি করেছেন তারা এই ভোগ্য বস্তুসমূহ কিছুতেই গ্রহণ করেন না।

তাহলে এখানে এই তাৎপর্য পাই যে পৃথিবীর সকল লোভনীয় বস্তু একদিকে ও আত্মজ্ঞান অপরদিকে। এখন তাদের একটিকে নির্বাচন করতে হবে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বালক নচিকেতা, বয়সে নবীন নচিকেতা, অপরিণতবৃদ্ধি নচিকেতা আত্মবিদ্যার গলায়ই বরমাল্য পরিয়েছিলেন। সামান্য বালকের মনেও আত্মবিদ্যার জন্য গভীর আকর্ষণ। মানুষের অন্তরের তৃপ্তি যে বাস্তব সুখ ভোগে নয়, জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য, বিদ্যা আহরণে, এর থেকে বড় সত্য কিছু নেই। অবিমিশ্র বাস্তব ভোগসুখে মানুষের মন তৃপ্তি পায় না, তার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ না হলে তার তৃপ্তি নেই।

অনুরূপ একটি গল্প পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে।[56] এই গল্প ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীকে নিয়ে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর সম্পত্তি দুই পত্নীকে (অপরজন কাত্যায়নী) ভাগ করে দেবার নিমিত্তে মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। এজন্য আমার সম্পত্তি তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই।

[56] বৃহদারণ্যক উপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ১-৪ শ্রুতি।

তা শুনে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন,—ভগবান, যদি এই সমস্ত পৃথিবী বিত্তে পূর্ণ হয় এবং তা আমার অধিকারে আসে, তাতে কি আমি অমৃতত্ত্ব তথা মোক্ষপ্রাপ্ত করতে পারব?

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন,— না, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ত্বের আশা নেই।

তা শুনে মৈত্রেয়ী বললেন,—যার দ্বারা আমি অমৃতত্ত্ব লাভ করতে পারব না, তা নিয়ে আমি কি করব? এবিষয়ে আপনি যা জানেন, আমাকে বলুন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তর আর ছিল না। এজন্য উচ্ছ্বাসিত হয়ে স্বীয় পত্নীকে বলেছিলেন, তুমি সত্যই আমার প্রিয়, তাই এমন প্রিয় কথা বলেছ। এসো, বসো, এই তত্ত্ব ব্যাখ্যান করছি।

পূর্বের গল্পের মত এখানেও দু'টি বিভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে একটি নির্বাচনের প্রশ্ন এসে পড়ে। একদিকে ঐশ্বর্যপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী, অন্যদিকে আত্মজ্ঞান। নচিকেতার মত এখানেও মৈত্রেয়ী আত্মজ্ঞানের গলাতেই বরমাল্য পরিয়েছিলেন। ভোগস্পৃহা নয়, সমগ্র ত্যাগ করে অনাবিল সুখের সন্ধান করেছিলেন।

চার্বাকপন্থীরা বলে থাকে "যাবৎ জীবন থাকবে, সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করবে, প্রয়োজনে ঋণ করে হলেও ঘৃত পান করবে। এই স্বপক্ষে যুক্তি খুবই সহজ। ঋণ করে পরিশোধ করতে না পারলেই বা কি হবে? যে দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়, তা কি আর ফিরে আসতে পারে!"[57] অপরদিকে বৈদিক দর্শন বলে, ভোগে নয় ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। ভোগস্পৃহা যত বাড়তে থাকে, দুঃখও ততই বাড়তে থাকে। আপনি স্বয়ং বিবেচনা করে দেখুন, উত্তর পেয়ে যাবেন।

ভোগে মানুষ শান্তি পায় না, বিষয়ভোগের স্পৃহা তাতে আরও পরিবর্ধিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত ভোগতৃষ্ণা বা কামনা চরিতার্থ করলে, তাতে তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি পায়। মানুষ তখন কামনার দাস হয়ে পড়ে। সে মনের শান্তি হারায়, ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। মন হল একান্ত মানুষের নিজস্ব জিনিস।

[57] যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
—চার্বাক দর্শন, ২৫ শ্লোক। সর্বদর্শন সংগ্রহ—শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

বিষয়গুলোর ওপর মানুষের আধিপত্য নেই, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসন শান্তি ও স্বস্তির পথের নির্দেশ দেয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—কর্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। হে অর্জুন, "যে কর্ম কর্তব্যবোধেই নিয়ত সম্পাদিত হয় এবং সঙ্গ ও ফল বর্জন করা হয়, সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হয়।"[58] উদ্দেশ্য এই যে, কর্মফল সম্পর্কে উদাসীন থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, কর্মফলে কোনপ্রকার আসক্তি আনা যাবে না। তাই বলা হয়েছে—"কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও নয়, কর্মফলের হেতু তুমি হয়ো না, অকর্মের সঙ্গেও যেন তোমার সম্বন্ধ না থাকে।"[59] এই কর্মফল ত্যাগের আদর্শকে গীতায় শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে।

মানুষ ভোগ করুক, কিন্তু এরূপ সংযমের সাথে করুক যাতে অন্যের স্বার্থের হানি না হয়। তার কারণে অন্যের স্বার্থের হানি নিজের স্বার্থেরই সামিল হবে। কারণ, আমাদের সকলকে পরিব্যাপ্ত করে তো একই সত্তা বিরাজমান। সেই জন্যই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, "বিশ্বে যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, সমস্তই ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত। সেই কারণে ত্যাগের সহিত ভোগ করা কর্তব্য। কাহারও সম্পদে লোভ করা উচিত নয়।"[60]

সমগ্র জগৎ ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, তিনি সকল বস্তুর অন্তরে বাস করেন এবং সকলের অন্তরে উপস্থিত থেকে সব কিছুকেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি এই বিশ্বের অন্তরে উপস্থিত থেকে বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। মানুষকে এই অন্তর্যামী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে হবে, সর্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন করতে হবে। এপ্রকারের অনুভূতি যাঁর হয়েছে, তাঁর পক্ষে এই জগতের কোন বস্তুর উপরই কোনরূপ আসক্তি বা মোহ থাকবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে আসবে অনাসক্তি। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব তাঁর অন্তর ভরে উঠবে। তখন

---

[58] কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৯

[59] কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৪৭

[60] ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥—যজুর্বেদ ৪০।১

তিনিই পারবেন সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে সকলকে ভালবাসতে, সব কিছুকে ভোগ করতে। কিন্তু যেখানে ত্যাগ নেই, আছে মোহ, আছে আসক্তি, সেখানে দেখা দিবে দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তি। যিনি আসক্তিহীন তিনিই স্বাধীন। মানুষকে এভাবে কামনা-বাসনা ত্যাগ করে জগতকে ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করে ভোগ করতে হবে। এভাবে যিনি ভোগ করতে পারবেন তিনিই আনন্দ লাভ করবেন।

উপরোক্ত নীতি অনুসারে ভোগে বাধা নেই, অন্যের স্বার্থে হানি করে ভোগে বাধা আছে। একথা খুবই সত্য যে, হৃদয়বৃত্তির বিস্তারে স্বার্থকে শোধন করা যায়। যখন আমরা কোন অপরিচিত মানুষকে দেখি, তার প্রতি সোজাসুজি আমরা আকৃষ্ট হই না। কিন্তু কথা বলতে বলতে যদি কোন যোগসূত্রের আবিষ্কার হয়ে পড়ে, তখনই পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। এক জায়গায় বাড়ি বা এক কলেজে পড়তাম, বা একটি বিশেষ মানুষের উভয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা আছে, এভাবে একটি পরোক্ষ সম্বন্ধ আবিষ্কার হয়ে গেলে পরস্পরের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। সকলেই যে আমাদের একান্ত আপনজন, এই সত্য যদি উপলব্ধি হয়, তাহলে কারও অপরের স্বার্থহানি করার প্রবৃত্তি আসবে না। সন্তানের স্বার্থ যেমন ভালবাসার ভিত্তিতে মাতার স্বার্থের সাথে একীভূত হয়ে যায়, তেমনি সকলের একত্ববোধ আমাদের স্বার্থকে পরার্থের সহিত সংযুক্ত করবে। সকলকে আপনজন বলে জেনে পরার্থের দ্বারা স্বার্থকে শোধিত করে নেওয়াই শ্রেয়ের পথ। শ্রেয় বলে সকলেই তোমার আপনজন, সকলের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোগ কর, ভাগ করে ভোগ কর। এখানে ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত কর্ম সামগ্রিক কল্যাণের সাথে সংযুক্ত, তাই তা নিজেরও কল্যাণ প্রাপ্ত করে।

মূল কথা হল, পরের ধন গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, তা হলে অপরের স্বার্থ-হানি হবে। অপরের স্বার্থ হানি যাতে না ঘটে সেই জন্য সংযমের সাথে ভোগ করতে হবে। অপরের স্বার্থের প্রতি এতখানি সম্মান দেখানো কেন প্রয়োজন? তার কারণ, কেউ তো পর নয়, সকলেই আপনজন। বেদ বলছে,—"ভাই ভাই, বোন বোন বা ভাই ও বোনের মধ্যে যেন ঈর্ষা, দ্বেষ (হিংসা) না ছড়ায়, সবাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা সুখদায়ক কল্যাণকারী বাণী বলুক।"[61]

[61] মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।

ভাবার্থ এই—মানবজাতির আমরা সকলেই পরস্পরের ভাই বোন। নিজেদের পরিবারের ভাইবোনের মতোই আমরা যেন একে অপরকে কখনও বিদ্বেষ না করি। একে অপরের স্বার্থের হানি না করি। সকলে যেন একসাথে মিলে একমত, এক পথ ও একব্রতে যুক্ত হয়ে একে অপরের উদ্দেশ্যে শুভবাণী বলি ও এভাবে সুখী ও আদর্শ জীবনযাপন করি।

কিন্তু এই পথটি খুব সহজ নয়। সংযমের সাথে ভোগ করতে হলে নিজের দেহ ও মনের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা প্রয়োজন। সেই জন্যই নীতির পথকে দুর্গম পথ বলা হয়। মনের মধ্যে সব সময় একটা দোটানার সংঘর্ষ থাকে। যা আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক তার প্রতি স্বভাবতই মন ছোটে। তাকে সংহত করে সেই পথে চালিত করতে হবে যাতে অপরের স্বার্থহানি না হয় এবং নিজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এই মানসিক দ্বন্দ্বকে উপনিষদে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে। যা শ্রেয় তা হল কল্যাণের পথ, যা প্রেয় তা হল অকল্যাণের পথ। যা বর্তমানেই সুখকর, যা আপাতদৃষ্টিতে মধুর, যা ইন্দিয়কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তাই হল প্রেয়। যা চিত্তাকর্ষক এবং মনকে সহজেই ভোলায়, তাকে প্রেয় বলে। তা আমাদের সিদ্ধির পথ হতে ভ্রষ্ট করে। আর যা আপাতদৃষ্টিতে কঠোর, যা বর্তমানে সুখকর নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ আনয়ন করে, তাই হল শ্রেয়। তা কল্যাণকর বলেই তাকে শ্রেয় বলা হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, মোক্ষলাভের জন্য বিবেকজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে পশু, স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত বিষয় একেবারে ত্যাগ করা আবশ্যক কি-না? সংসারে থেকেও আত্মতত্ত্ব জানা যায় কি-না, না কি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করা একান্তই আবশ্যক?

পুরুষার্থ লাভ করতে হলে ত্যাগের যে প্রয়োজন আছে তাতে কোনপ্রকার সন্দেহ নেই। ত্যাগী না হতে পারলে কেউ মোক্ষলাভ করতে পারে না। কিন্তু এই ত্যাগ বাহ্যিক নহে, আন্তরিক ত্যাগ। আসক্তি ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ। আসক্তির ত্যাগ হলে, বিষয়ের বাহ্যিক ত্যাগ না করলেও চলতে পারে। অনাসক্ত পুরুষ বিষয়ে ভোগ করেও মোক্ষলাভ করতে পারেন। এই সংসারের সমস্ত পদার্থই

সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥—অথর্ববেদ ৩।৩০।৩

অনিত্য এবং এই সকল অনিত্য পদার্থের ভোগ দ্বারা চিরস্থায়ী যে অমৃতত্ত্ব তা লাভ করা যায় না। এই কারণে তিনি এই সংসারের অনিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না, কোন বস্তুর প্রতিই আসক্ত হয়ে, তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হন না। এটাই ত্যাগ বা বৈরাগ্য। কিন্তু এই ত্যাগ বাহ্যিক ত্যাগ নয়, আন্তরিক ত্যাগ, আসক্তির ত্যাগ।

নচিকেতার উপাখ্যান হতেও এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। যমরাজ বহু কাম্যবস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে আত্মজ্ঞান লাভের বাধা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু নচিকেতা তাতে আকৃষ্ট হন নি। কারণ এসকল কাম্যবস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না, এগুলোকে তিনি কখনও প্রার্থনীয় বলে মনে করেন নি। কিন্তু তাই বলে তিনি সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, একথাও বলা যায় না। কারণ পূর্বে তিনি যমরাজকে বলেছিলেন,—"মানুষ কখনও ধন-সম্পদ দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে না, আপনার স্বাক্ষাত যখন হয়েছে তখন এসব অবশ্যই প্রাপ্ত করব। কিন্তু এসব কাম্যবস্তু আমার প্রার্থনীয় নয়, আত্মজ্ঞান লাভই আমার বরণীয়।"[62]

নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে, যথাপ্রাপ্ত আয়ু ও ধন তাঁর বর্জনীয় নয়, তবে ঐসব বস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই এবং ঐসব বস্তুকে তিনি প্রার্থনীয় বা বরণীয় বলে মনে করেন না।

আমাদের জীবনের আদর্শে আমরা ত্যাগকে প্রাধান্য দেব না ভোগকে প্রাধান্য দেব?

দু'য়েরই প্রয়োজন আছে, তাদের কোনটিকেই বর্জন করার প্রশ্ন ওঠে না। যজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রও আমাদের তাই বলে,—"ত্যাগের সহিত ভোগ কর"। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে কোন দোষ নেই, দোষযুক্ত হয় তখন, যখন তা অনিয়ন্ত্রিত আকারে সংঘটিত হয়। ইন্দ্রিয় দমনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের।

স্বার্থ ও পরার্থের যে দ্বন্দ্ব, সে সম্বন্ধেও উপদেশ এরূপ। স্বার্থবিলোপের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে স্বার্থশোধনের। ভোগে কোনো বাধা নেই,

---

[62] ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যাসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥—কঠোপনিষদ ১।১।২৭

অপরকে বঞ্চিত করে ভোগে আপত্তি আছে। আমাদের স্বার্থ যেখানে অন্যের স্বার্থের হানি করে সেখানে তাকে সংযত করতে হয়। কিন্তু তার প্রয়োজন হয় না, যদি স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারি। ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব বোধ হলে আমরা পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়তা উপলব্ধি করি। তখন স্বার্থ ও পরার্থ একীভূত হয়ে যায়, যেমন মায়ের স্বার্থ ও সন্তানের স্বার্থ একীভূত হয়ে যায়। জ্ঞানের সাহায্যে প্রেমের প্রসার সম্ভব, আবার প্রেমের প্রসার হলে স্বার্থবোধকে শোধন করা সম্ভব। আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে আমরা যেমন তৎপর হব, অন্য প্রতিটি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে আমাদের ততটুকুই তৎপর হওয়া উচিত।

মূল কথা হল, আমরা যদি সৃষ্টিকে সম্পুর্ণভাবে ত্যাগ করতেও চাইও, পারব না। কারণ সৃষ্টিকে ভোগ না করে জীবনধারণ অসম্ভব। শরীরমধ্যে যে বায়ুর ক্রিয়া চলছে তা সৃষ্টির অংশ, যে অন্ন-জল গ্রহণ করছি তাও সৃষ্টিরই অংশ। অন্যদিকে অতিরিক্ত ভোগও আমাদের ঈশ্বর থেকে দূরে রাখবে। ধন-বিত্তের দ্বারা মানুষ কখনোই তৃপ্ত হয় না। তাতে ভোগের তৃষ্ণা বাড়ে বৈ কমে না। তাই আমাদের উচিত ত্যাগের সহিত ভোগ করা, ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত জগতের সমস্ত প্রাণীকে নিজের পরিবারের মতই স্নেহ করা। মোক্ষলাভে ভোগ বাধাস্বরূপ নয়, ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করাই অতীব জরুরি। তা না হলে সারাজীবন ভোগের পিছনে ছুটতে ছুটতে এই জীবনের উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে।

ঈশ্বরের উপলব্ধিই মুক্তিলাভের পন্থা

যদিও পূর্বে মুক্তি বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে, তথাপি সেখান থেকে পরিস্কারভাবে বোঝা সম্ভব নয় যে, কিরূপ অবস্থায় জীব মোক্ষলাভ করে! মোক্ষলাভের জন্য প্রধান বিষয়টি কি! ঈশ্বরের উপলব্ধিই মুক্তিলাভের পথ, এতদ্ভিন্ন অন্য পথ নেই—নান্য পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়। এবার এই বিষয়টিরই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা মীমাংসার্থ অগ্রসর হওয়া যাক্।

যিনি সর্বস্থানে বিরাজমান, তাঁকে পাওয়ার জন্য, তাঁকে উপলব্ধির জন্য নতুন করে কোথায় যাব? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুল হৃদয় বলে,—“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাই নি তোমায়, দেখতে আমি পাই নি।” তিনি লুকিয়ে আছেন সেখানেই, অথচ আমরা দেখতে পারি না। তিনি তো আমাদের চক্ষুসম্মুখে উপস্থিত, প্রয়োজন শুধু তাঁকে দেখার সামর্থ্য। প্রয়োজন শুধু তাঁর উপলব্ধি। ‘পাওয়ার জন্য সামর্থ্য প্রয়োজন’, এই কথাটি যত সহজভাবে বলা যায়, অর্জন করা ততই কঠিন।

আমরা অবিদ্যার দ্বারা আবৃত, এজন্যই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখতে পাই না, তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। এজন্যই উপনিষদ বলছে,—“অসত্য হইতে আমাকে সত্যে নিয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে নিয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে নিয়া যাও।”[63]

জীব আনন্দ পেতে চায়, এর জন্যই মোক্ষের প্রার্থনা করে। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ,[64] ঈশ্বর রসস্বরূপ, জীব জীবনে আনন্দের অনুভূতি লাভ করে ঐ রসের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে।[65] জীব অনেক বেশি প্রাপ্ত করতে চায়, যার জন্য মোক্ষের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরকে না জেনে, তাঁকে উপলব্ধি না করে মোক্ষপ্রাপ্ত করবে কী করে?

অজ্ঞান থেকে কামনা, কামনা থেকে দুঃখ; এই তত্ত্ব যিনি জানেন না তিনিই দুঃখ পান। জ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রকার অবিদ্যাজনিত শোক বা মোহ থাকে না। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তাঁর অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, কাজেই তাঁর শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। আমাদের অবিদ্যাকেই দূরীভূত করতে হবে, যখন অবিদ্যা দূরীভূত হবে তখনই সত্যবিদ্যার প্রকাশ ঘটবে। ফলে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা দেখতে পাব, তাঁকে উপলব্ধি করতে পারব।

---

[63] অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি।
—বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।২৮

[64] আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।—বেদান্ত দর্শন ১।১।১২

[65] রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি॥—তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৭।২

এই দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সমস্ত জগৎ, কাছের ও দূরের সমস্ত বস্তু, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু ঘটনা—সমস্তই এক ব্রহ্মের বিকাশ। এজন্যই বলা হয়,—"তিনি দূরে এবং একইসঙ্গে নিকটেও। তিনি যেমন এই জগতে অনুস্যূত হয়ে আছেন, তেমনি জগতের বাইরেও আছেন।"[66] তিনি একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ।

পরমাত্মাকে অনুভব করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, বাইরে যে চঞ্চল প্রকৃতির লীলা চলছে তাতেও ব্রহ্ম আছেন; আবার যে অচঞ্চল স্থির সত্তার উপর আশ্রয় গ্রহণ করে এই লীলা চলছে তা'ও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। চঞ্চলতা ও অচঞ্চলতা, গতি ও স্থিতি; দুই-ই ব্রহ্মের সাথে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আছে। তাই বলা হয়—ব্রহ্ম চলেন, আবার চলেন না।

"সেই ব্রহ্মকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও তিনি গ্রহণীয় নন, অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা, তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছে, সেই ব্যক্তি চিত্তের নির্মলতা সাধনের পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল (নিরবয়ব) পুরুষকে দেখিতে পান।"[67]

"যেইরূপ প্রবহমান নদীসকল নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় বিশিষ্ট নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর (সর্বশ্রেষ্ঠ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।"[68]

এই আত্মা (ব্রহ্ম) সর্বভূতে আবৃত অবস্থায় থাকায় সকলের কাছে প্রকাশিত হন না, কিন্তু একাগ্র ও বুদ্ধি সহায়ে মেধাবীগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।"[69]

---

[66] তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দুরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥—যজুর্বেদ ৪০।৫

[67] ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৮

[68] যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৮

[69] এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
—কঠোপনিষদ ১।৩।১২

"প্রত্যেক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের মধ্যে যখন ব্রহ্মকে জানা যায়, তখনই সম্যক্ দৃষ্টি বা প্রকৃত জ্ঞান হয়। এই প্রকারের সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। আত্মার জ্ঞান দ্বারা তিনি বীর্য লাভ করেন, এবং বিদ্যার জ্ঞানদ্বারা তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।"[70] "ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে সমদ্ভুত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজনিত মোহের দ্বারা সমস্ত জীব মোহপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যেসব পুণ্যকর্মা ব্যক্তির অশুদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-মোহ থেকে নির্মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করে।"[71] ফলে আমাকে প্রাপ্ত করে।

"এই পরমাত্মার রূপ দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। কেউই ইঁহাকে এই চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারে না। মননরূপ সম্যগ্‌দৃষ্টির সাহায্যে বিষয়কল্পনা-শুন্য বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা হৃদয়ে তিনি উপলব্ধ হন। যাঁহারা তাঁহাকে ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা অমর হন।"[72] "এই প্রকাশমান, বিশ্বস্রষ্টা, সর্বব্যাপী ঈশ্বর প্রাণীগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং সংস্কৃত মনের সাহায্যে তিনি প্রকাশিত হন, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ত্ব লাভ করেন।"[73]

"পরমেশ্বরের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কেহই তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারে না। হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই পরমেশ্বরকে যাঁহারা অনুভূতি ও মনন দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মোক্ষলাভ করেন।"[74] যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন (মোক্ষলাভ করেন)।[75] এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি

---

[70] প্রতিবোধবিদিতং মতমম্ তত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং ॥—কেনোপনিষদ ২।৪

[71] ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত। সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা ॥
—শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৭।২৭-২৮

[72] ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লুপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥—কঠোপনিষদ ২।৩।৮

[73] এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তিঃ ॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪।১৭

[74] ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুসা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪।২০

[75] ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।—তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।১।২

উপলব্ধি করেছেন, তিনি কখনও সংসার বা মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হয়ে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন।

"সাত্ত্বিক প্রকৃতির ন্যায় শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষের নিষ্কাম ভাবনার উপযোগী সমস্ত কর্মই মুক্তির উপযোগী। যেমন কোন গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য যান-বাহনের প্রয়োজন হয়, পৌঁছানোর পর আর বাহনাদির প্রয়োজন থাকে না, ঠিক সেরূপ নিষ্কাম কর্ম যান-বাহনরূপে মনুষ্যকে বহন করিয়া বৃত্তিরহিত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়। সেখানে যথার্থ জ্ঞানই তাঁকে শুদ্ধ ও শান্ত রেখে মুক্তির (মোক্ষ) আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে।"[76] অবিদ্যাগ্রস্থ জীব অস্মিতাজনিত প্রাকৃতিক বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ উৎপাদন করার কারণে বন্ধনপ্রাপ্ত হয় এবং পুরুষার্থের দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ করতে পারিলেই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

"ঘৃতের উপর যে সরের মত সুক্ষ্ম আবরণ থাকে, তার ন্যায় অতি সুক্ষ্ম সকল জড় ও জীবে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান এই মঙ্গলময় ঈশ্বরকে জানিয়া এবং বিশ্বের এক পরিবেষ্টনকারী প্রকাশমান পরমেশ্বরের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া সাধক সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।"[77] অব্যক্ত থেকে পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা সর্বব্যাপী ও অনুমানের চিহ্নবর্জিত। জীব এই পরমাত্মাকে জানিয়া অমরত্ব লাভ করে,—মুক্ত হয়।"[78]

সমগ্র বিশ্বচরাচর ও তার বিচিত্র রূপ ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত।[79] এই যে সৃষ্টির অন্তরালে স্থিত ঈশ্বর, তাকে উপলব্ধি করতে পারলে জগতের উপর কোন আসক্তি থাকবে না। জীব তখন জগতের কোন পদার্থকেই নির্বিশেষ মূল্য দিবে না। কোন জিনিসেরই নিজস্ব কোন মূল্য নেই, কোন জিনিসই শুধু তার জন্যই প্রার্থনীয় নয়। জগতের বিষয়সমূহের একমাত্র মূল্য যে, এরা ঈশ্বরের বিকাশ। এই প্রকার দৃষ্টি লাভ করলে মানুষের চিত্ত থেকে বাসনা ও মোহ দূরীভূত হয়। মোহের

---

[76] ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্যসর্বং প্রকৃতিবৎ।—সাংখ্য দর্শন ৩।২৯

[77] ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈ॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪।১৬

[78] অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥—কঠোপনিষদ ২।৩।৮

[79] ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।—ঈশোপনিষদ ১

স্থানে জ্ঞানের উদয় হয়। সার্বভৌম অধিকারের যে পরম আনন্দ তা-ই মোহের স্থান অধিকার করে। এই অবস্থাতে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের দর্শন সম্ভব হয়। সকল বস্তুর মধ্যেই সেই পরম আনন্দময় সত্তা প্রকাশমান। এই আনন্দময় সত্তার প্রকাশ হলেই বুঝতে পারা যায় যে, জগতের দুঃখের রূপ ধরে যারা আসে তারা দুঃখময় নয়। দুঃখ ও বেদনার অন্তরালে আছে আনন্দের প্রস্রবণ। এই আনন্দের ধারায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের দর্শন লাভ হলে আর দুঃখ থাকে না। তখন উপলব্ধি হয় জগৎ সত্যই মধুময়।

এই সংসারে বাস করেও মৃত্যুকে অমৃত পরিণত করতে হবে। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা তা হয় না। মানুষের পরিপূর্ণ সত্তা দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হবে। এরূপ উপলব্ধি থেকেই আমাদের হৃদয় সকলের প্রতি প্রেম ও আনন্দে পূর্ণ হবে।

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক কী?

অদ্বৈতবাদীগণে মতে ঈশ্বর এবং জীব এক ও অভিন্ন, যে এঁদের মধ্যে ভিন্নতা দেখে সে অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন। আবার তাঁরা এ-ও স্বীকার করে, জীব ঈশ্বরের অংশ। অর্থাৎ এক ঈশ্বরই বহু হয়েছেন।

তাঁদের মতে একমাত্র পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। তাঁর থেকে এই অনাত্ম, পরিবর্তন ও মরণশীল জড় কীভাবে উৎপন্ন হল, তা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। একবস্তু থেকে দ্বিতীয় বস্তু দুই প্রকারে উৎপন্ন হতে পারে, প্রথমতঃ, বিকার দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ, বিবর্তদ্বারা। দুধ পরিবর্তিত হয়ে দধিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে বিকার বলে। ব্রহ্ম এভাবে জগৎ উৎপন্ন করতে পারেন না, কারণ তা হলে অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মে পরিবর্তন স্বীকার করতে হবে। কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন না করে অন্য এক প্রকারে নতুন বিষয় উদ্ভাবিত করা যায়, তাকে বিবর্ত বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা মরুভূমিতে সরোবরের মরীচিকা। এ সমস্তই ভ্রান্তজ্ঞান। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, কিন্তু ভ্রান্তিবশে মানব তাতে জগৎ দেখছে। এটি সৃষ্ট জগৎ। কিন্তু তাঁরা বলেন মানুষও ব্রহ্ম। অতএব স্রষ্টা নিজেতেই জগৎরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান আরোপ করছেন। কিন্তু এটি পূর্ণজ্ঞানময় ব্রহ্মের স্বরূপ হতে পারে না। অতএব বলতে হবে যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটি

বিপরীত জ্ঞানের বিষয় বা অবিদ্যার অস্তিত্ব আছে, যা ব্রহ্মের থেকে ভিন্ন, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় তার প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এ মত আমাদের আত্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। জগৎ মিথ্যা নয় এবং আমরাও পূর্ণব্রহ্ম নই, তা আমরা জানি। যে মীমাংসায় আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তা কখনও সত্য হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এই দু'টো বিষয়ের একটিও যে সত্য নয়, তা ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি। কারণ ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন হতে পারে না। যদি অভিন্নতা স্বীকার করা যায়, তবে জীবের দোষে ঈশ্বরও দুষ্ট হবেন। পরন্তু ঈশ্বর কোনপ্রকার দোষে দুষ্ট নন। আবার ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন হলে কর্মফল বিষয়েও সমস্যা দেখা দেখা দিবে, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের কর্মফল ঈশ্বর ভোগ করবে; এরূপ একটি সম্ভাবনা উদয় হবে, যা ঈশ্বরের স্বরূপ বিরুদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন নন, এবং জীবাত্মাগুলোও পরস্পর ভিন্ন।

জীব ঈশ্বরের অংশও হতে পারে না। যদি জীব ঈশ্বরের অংশ হয়, তবে ঈশ্বরও জীবের ন্যায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রাপ্ত করবেন, যেমন বস্ত্রের সূত্র মলিন হলে বস্ত্রও মলিন হয়। কিন্তু ঈশ্বর সুখ-দুঃখ অনুভব করেন না, তিনি সদা আনন্দময়। সুতরাং জীব ঈশ্বরের অংশ নয়, এঁরা ভিন্ন সত্তা।

আমরা দেখলাম, জীব ঈশ্বরের অংশ হতে পারে না এবং ঈশ্বরও জীব হতে পারে না। পরন্তু অদ্বৈতবাদীগণের পরস্পরবিরুদ্ধ দু'টি বিষয় একে অপরকে খণ্ডন করেছে।

অন্যদিকে বস্তুবাদী চার্বাকগণ বলেন—"দেহব্যতিরিক্ত আত্মার কোনও অস্তিত্ব নেই'। আরও বলেন—'মনুষ্য শুধুমাত্র চৈতন্যগুণসম্পন্ন একটি দেহ এবং চৈতন্য হল কতগুলো বস্তুর মিলনে উৎপন্ন একটি রাসায়নিক পদার্থের ন্যায়। যেমন, পান-সুপারি-চুনের মিশ্রণে লাল রং উৎপন্ন হয়; বস্তুত এই তিনটির একটিতেও লাল রং নেই। মনুষ্যদেহও চৈতন্যও সেরূপই কয়েকটি বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরি। তাদের সিদ্ধান্ত হল—মানুষের চৈতন্য ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ দেহ থাকে। দেহব্যতীত চৈতন্য কোথাও দেখা যায় না, সুতরাং এটি দেহরই একটি গুণ। এজন্য এই দেহে আত্মা বলে পৃথক কোনও বস্তু নেই।"

এর উত্তরে বলা যায় ‘পান, সুপারি ও চুন; এই তিন বস্তুতে লাল রং না থাকলেও লাল রং এই তিন বস্তুতে সুক্ষ্মভাবে বিরাজমান থাকে’; যেমন বীজে বৃক্ষের আদর্শ বর্তমান থাকে। অন্যদিকে চৈতন্য দেহের গুণ হতে পারে না, কারণ মৃত্যুর পর ব্যক্তির দেহ উপস্থিত থাকলেও চৈতন্য থাকে না। সুতরাং এই চৈতন্য দেহের অতিরিক্ত কোনও সত্তাই হবে। পরন্তু চার্বাকগণ এ-ও স্বীকার করেন যে, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তু থেকে ভিন্ন। যদি এ-ই হয় তাহলে আমরা এই দেহের যে প্রতীতি লাভ করি, তারা নিশ্চয় দেহ থেকে ভিন্ন। এবং এই সত্তাই (জীবাত্মা) আমাদের দেহকে উপলব্ধি করেন। সুতরাং দেহের এই চৈতন্য আত্মারই ধর্ম।

চার্বাকগণ ঈশ্বরকেও স্বীকার করেন না। সে যাইহোক, প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করা হয়ে গিয়েছে, এখন পুনরায় আলোচনার কোন আবশ্যকতা নেই। আপাতত মূল প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করা যাক্।

ঈশ্বর ও জীব; সত্তাদ্বয় ভিন্ন। ভিন্ন হলেও সম্বন্ধ সম্ভব। আমরা লক্ষ্য করলে এমন উদাহরণ অনেক দেখতে পাব, যেখানে ভিন্ন বস্তুতে সম্বন্ধতা হয়।

এখন, ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক যদি পূর্বোল্লিখিত একটিও না হয়, তবে কীরূপ?

ঋগ্বেদ বলছে,—“সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সম সম্বন্ধযুক্ত দুইটি পক্ষী মিত্র রূপে একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফলকে স্বাদের জন্য ভক্ষণ করে এবং অন্যটি ফলকে ভক্ষণ না করিয়া সব দিক দেখিতেছে।”[80]

বৃক্ষটি জগৎ এবং দুইটি পক্ষীর একটি জীব, অন্যটি ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই অনাদি। উভয়ই সখা স্বরূপ। জীব সংসারে পাপ পূণ্যের ফলভোগ করে এবং ব্রহ্ম ফল ভোগ না করিয়া সাক্ষী রূপে বর্তমান।

অর্থাৎ জীব ভোক্তা ও ঈশ্বর অভোক্তা। উপরোক্ত বেদমন্ত্র থেকেই এই সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায়। উভয়ই একত্রে অবস্থান করছে, অথচ একজন প্রকৃতিরূপ বৃক্ষফল ভক্ষণ তথা ভোগ করছে, অন্যজন শুধুমাত্র দর্শন করছে; স্বাক্ষীস্বরূপ।

---

[80] দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যং পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাক শীতি ॥—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০

ভোগের জন্যই জীবের বন্ধন, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি জন্মে; ঈশ্বর ভোগ করেন না, এজন্য তাঁর এসব বন্ধনাদি দুঃখ প্রাপ্তি হয় না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ভোগের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্তি কীভাবে হয়?

পাঠক, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার উপাখ্যানে আমরা কি দেখেছিলাম! দেখেছিলাম যম যখন তৃতীয় বরে নচিকেতাকে বিত্ত, ধন, এমনকি সমস্ত আকাঙ্খিত বস্তু দিতে চাইলেন, তখন নচিকেতা বললেন,—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো; বিত্ত বা ধন দ্বারা মনুষ্যের তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ মানুষ কখনো ধনরত্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করতে পারে না, তার চিত্ত আরও উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্খিত হয়। এর ফলে তার মনোনিবেশ উচ্চতর বস্তুপ্রাপ্তির দিকেই থাকে, যার কারণে ঐ বস্তুর প্রতীতি জন্মে ও তদ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের। সকল মনুষ্যই অমৃতের (ঈশ্বরের) সন্তান।[81]

পিতা যেরূপ পুত্রের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে পুত্রকে কর্মে নিযুক্ত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে তার অতীতের কর্মানুসারে বর্তমান কর্মে নিযুক্ত করেন। প্রতিটি পিতার কাছে তাঁর সন্তান অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ পিতা তাঁর সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে জড়িয়ে ধরেন, সেরূপ ঈশ্বরও তাঁর সন্তানরূপী সমস্ত জীবকে সবদিক হতে আচ্ছাদন করে আছেন।

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক মাতা-পুত্রের। তুমি (ঈশ্বর) আমাদের মাতা।[82]

মাতা যেরূপ সন্তানকে শিক্ষা দেন, আমার সাথে সাথে বলো—"সদা সত্য কথা বলবো, বিদ্বান ও গুরুজনের পূজা, সেবা, সৎকার করবো" ইত্যাদি। ঈশ্বরও ঠিক সেরূপ বেদের দ্বারা জীবকে উপদেশ করছেন।

পূর্ণ কৃপাময়ী জননী যেরূপ নিজ সন্তানদের নিজ সন্তানদের সুখ ও উন্নতি কামনা করেন, সেরূপ ঈশ্বরও জীবের উন্নতি কামনা করেন।

---

[81] শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা...—যজুর্বেদ ১১।৫

[82] ত্বং মাতা...—ঋগ্বেদ ৮।৯৮।১১

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। ঈশ্বর পূর্বে উৎপন্ন গুরুদেরও গুরু।[83]

গুরু যেরূপ শিষ্যকে ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদির শিক্ষা দেন, সেরূপ ঈশ্বরও বেদের মাধ্যমে এর শিক্ষা দেন।
গুরু যেরূপ সত্য আচারকে গ্রহণ করান এবং সমস্ত বিদ্যাপ্রাপ্তির হেতু হয়ে সকল বিদ্যা শিষ্যদের প্রাপ্ত করিয়ে থাকেন, ঈশ্বরও সেরূপ করেন।

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক রাজা-প্রজার। কারণ, নিজ মহিমাবলে তিনি (ঈশ্বর) চেতন ও জড়জগতের রাজা।[84]

রাজা যেরূপ নিজ প্রজাদের সর্বদা রক্ষা করেন, দুষ্কর্মাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং প্রজাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হন, সেরূপ ঈশ্বরও জীবের পাপপুণ্যরূপ কর্মের ফল প্রদান করেন, জীবের দুর্গুণসমূহ দূর করে যা উৎকৃষ্ট তা-ই প্রদান করেন।

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক উপাস্য-উপাসকের। বেদ বলছে— "পরমৈশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করো।"[85]

উপাসক যেরূপ মনোকামনা লাভ, আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইত্যাদি লাভের নিমিত্তে উপাস্যের উপাসনা করেন, ঈশ্বর উপাস্য দেব; সুতরাং ঈশ্বর উপাসককে ঠিক সেইরূপ মনোকামনা প্রাপ্ত করান।

ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক বন্ধুর ন্যায়। তিনি (ঈশ্বর) আমাদের বন্ধু।[86]

বন্ধু যেরূপ নিজ বন্ধুর সাহায্যকারী, সুখ-দুঃখে বন্ধুর নিকট সর্বদা উপস্থিত থাকেন, সেরূপ ঈশ্বরও পৃথিব্যাদি সমস্ত জীবের সাহায্য ও রক্ষণ সুখ দান করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানলাম, ঈশ্বর জীবের পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, উপাস্য, বন্ধু ইত্যাদি এবং জীব তাঁর পুত্র, শিষ্য, প্রজা, উপাসক, বন্ধু ইত্যাদি।

---

83 স এষ পূর্বেষামপি গুরু...—যোগদর্শন ১/২৬

84 য়ঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভুব।—যজুর্বেদ ২৩।৩

85 ইন্দ্রমিস্তেতা...—সামবেদ ২৪২

86 স নো বন্ধুর্জনিতা...—যজুর্বেদ ৩২।১০

বৈষ্ণবগণ বলেন,—জীব ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সেবা করাই জীবের কর্তব্য। এটিও ভুল, কেননা 'ঈশ্বর পূর্ণ', তাঁর সেবা গ্রহণের কোনো কামনা নেই। পরন্তু যার কামনা আছে তিনি পূর্ণ নন, আর ঈশ্বর কখনও অপূর্ণ হন না। এটি যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি নিজেদের উন্নতির জন্য, ঈশ্বরকে জানার জন্য, কারণ তাঁকে জেনেই জীবের মুক্তি হয়, অন্য উপায় নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি

প্রকৃতি নিত্য, এই নিত্য প্রকৃতির অভিব্যক্তিই জগৎ। কারণ-প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত থাকে বলে প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। প্রকৃতি হল নির্বিশেষ ও নিরবয়ব। এজন্য প্রকৃতি প্রত্যক্ষগোচর নয়। প্রকৃতি হল এক সর্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অসীম ও জগতের আদিকারণরূপ জড়শক্তি। প্রকৃতিতে জগতের স্থিতি এবং প্রকৃতিতেই জগতের লয়। কারণরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত ও প্রধান, এবং কার্যরূপ প্রকৃতি সৎরূপে প্রকাশিত। অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতি ত্রিগুণরূপে সমবেত হয়ে কার্যাকারে পরিণত হয়। একই জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে নানা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেরূপ এক একটি গুণের প্রাধান্য অনুযায়ী ও সহকারীভেদে একই প্রকৃতি নানা পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতির পরিণামের ফলে জগতের সৃষ্টি, আবার প্রকৃতির পরিণামের ফলে জগতের লয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে পরিণাম ঘটে। অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়। এরূপ পরিণামকে বলা হয় প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম বা সদৃশ পরিণাম। এই পরিণাম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় ঘটে। এই সাম্যাবস্থা যখন বিনষ্ট হয়, তখন প্রকৃতিতে অপর একপ্রকার পরিণাম দেখা যায়। এই পরিণামে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ–এর পারস্পরিক শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে। এর ফলে কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ আবার কখনও তমঃ গুণের প্রাধান্য ঘটে। প্রকৃতির এরূপ পরিণামকে বিরূপ পরিণাম বা বিসদৃশ পরিণাম বলে। বিরূপ পরিণামের ফলে জগতের সৃষ্টি এবং স্বরূপ পরিণামের ফলে জগতের লয় সূচিত হয়। প্রলয়কালে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সদৃশ পরিণাম হয়। গুণগুলোর স্বভাব পরিণাম, পরিণত না হয়ে এরা ক্ষণকালও থাকতে পারে না। তাই সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে প্রলয়কালেও পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতির স্বরূপ

এই জগতের ত্রিবিধ অনাদি সত্তার মধ্যে প্রকৃতি একটি। প্রকৃতি শব্দের উৎপত্তি 'কৃ' ধাতু থেকে (প্র–কৃ+তি)। 'কৃ' ধাতুর অর্থ হল করা। সুতরাং প্রকৃতি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থে সেই প্রকৃতি, এই বিশ্ব যার কৃতি। বিশ্ব এবং তার যাবতীয় জড়বস্তু এবং প্রাণীর, মানুষের বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহং এবং ইন্দিয়াদির তথা আত্মা ভিন্ন মানুষের সমস্ত অবশিষ্ট সত্তার, বিশ্বের যাবতীয় পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মূল অনিঃশেষ কারণ প্রকৃতি।

বেদ বলছে—"এই নিত্য প্রকৃতি সর্বদাই পরিণামযুক্তা, পুরাতন, নব নব রূপধারিনী এবং সর্ব কাজে করণ রূপে বিরাজমানা। প্রত্যেক গতিশীল জীবের সঙ্গেই এই প্রকৃতি নিজের স্বরূপ ও সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছে।"[87]

প্রকৃতি এই জগতের মূল উপাদান কারণ, কিন্তু তার মূল নেই। বিশ্বের যাবতীয় কার্য এবং সংঘাতের মূল কারণ এই প্রকৃতি। প্রকৃতি জগতের সব বস্তুরই মূল উপাদান কারণ, কিন্তু তার কোন উপাদান কারণ নেই। কিন্তু নেই কেন? উত্তরে মহর্ষি কপিল বলছেন—

"মূল কারণের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কারণ রহিত না হইলে তাকে মূল কারণ বলা যায় না। মূল কারণ অকারণ অর্থাৎ কারণ রহিত হইয়া থাকে এবং তাহা অনাদি।"[88]

"এইরূপ ভাবে পরম্পরা হিসাবে কারণ মানিতে মানিতে অন্তে একস্থানে পৌঁছিতেই হইবে। যে কারণ অন্তে স্থিত হইবে তাহাকে প্রকৃতির সংজ্ঞা দেওয়া হয়।"[89]

প্রকৃতি জড়াত্মক, জড়শক্তির আধার, অচেতন এবং ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণের সমষ্টি এবং শক্তির মূল সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনার অবিকৃত এবং পূর্ণ সাম্য-প্রকৃতিই প্রকৃতি।

---

[87] এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্ব্বং বভূব।
মহী দেব্যু ষসো বিভাতি সৈকেনৈকেন মিষতা বিচষ্টে॥—অথর্ববেদ ১০।৮।৩০

[88] মূলেমূলাভাবাদমূলং মূলম্।—সাংখ্য দর্শন ১।৬৭

[89] পরাম্পর্য্যেহপ্যেকত্রপরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্।—সাংখ্য দর্শন ১।৬৮

সাধারণত গুণ বলতে আমরা ‘ধর্ম’কে বুঝি। দর্শনে (সাংখ্য) গুণ বলতে উপাদানকে বুঝায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি প্রকৃতির উপাদান। একটি রজ্জু যেমন তিনটি তারের সমষ্টি হতে পারে তেমনি প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমষ্টি। এগুলোকে গুণ বলার কারণ এই যে, এরা পুরুষ বা আত্মার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

প্রকৃতির গুণগুলো খুবই সূক্ষ্ম বলে এদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে গুণগুলোর কার্য থেকে গুণগুলোর অস্তিত্বকে অনুমান করা যায়। এদের অস্তিত্বকে অনুমান করার পদ্ধতি হল এই,—

সংকার্যবাদ অনুসারে কার্য এবং কারণ সমভাবাপন্ন। জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে তিনটি জিনিস দেখা যায়। যথা—সুখ, দুঃখ ও ঔদাসীন্য। যেমন, ‘প্রভাতে পাখির গান’ সঙ্গীতপ্রিয় রসিককে দেয় সুখ, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেয় দুঃখ, আর অরসিক জন থাকে ঐ গানের প্রতি উদাসীন। জগতের প্রতিটি বস্তুই যখন কার্য এবং কার্যের মধ্যে যখন সুখ, দুঃখ ও উদাসীন্য এই তিনটি জিনিস দেখা যায়, তখন জগতের সকল বস্তুর মূল উপাদান যে প্রকৃতি তার মধ্যে নিশ্চয়ই এই তিনটির কারণ থাকবে। তাদের কারণ হল যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

মহর্ষি কপিল বলছেন—“প্রকৃতি পুরুষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমানের দ্বারা তাহাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন দূরে পর্বত মধ্যস্থ অগ্নির জ্ঞান ধূম ও প্রকাশাদির প্রত্যক্ষের দ্বারা হইয়া থাকে সেইরূপ পৃথিব্যাদি কার্য, ভোগাদি চিহ্ন ও রচনাদি কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া সৃষ্টির উপাদান কারণ জড় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ স্বরূপ প্রকৃতি, ভোক্তা জীবাত্মা ও অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হইয়া থাকে।”[90]

[90] অচাক্ষুষাণামনুমানেনবোধোধূমাদিভিরিববহ্নেঃ।—সাংখ্য দর্শন ১।৬০

প্রকৃতির গুণত্রয় তত্ত্ব

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সতের ভাবের নাম সত্ত্ব, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা উত্তম। সুতরাং পুরুষের উৎকৃষ্ট বা উত্তম উপকরণই সত্ত্ব। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, লঘু ও প্রকাশক। প্রীতি, তৃপ্তি, আনন্দ প্রভৃতি সুখের যাবতীয় অবস্থা সত্ত্বগুণের কার্য। অগ্নির ঊর্ধ্বগতি, বায়ুর অবাধ সঞ্চরণ প্রভৃতি লঘুতার পরিচায়ক। এই শ্রেণীর যাবতীয় কার্যের জন্য সত্ত্বগুণ দায়ী। সেরূপ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার শক্তি, দর্পণের প্রতিবিম্ব গ্রহণের শক্তি প্রভৃতি ব্যাপারও ঐ সকল বস্তুতে সত্ত্বগুণের অবস্থিতির জন্য সম্ভব হয়।

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, লঘু অর্থাৎ উর্ধ্বগতির হেতু, প্রকাশক অর্থাৎ বিষয়ের উদ্ভাষক বা অর্থজ্ঞানের আবরণের নাশক। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে দেহের শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়।[91]

রাগযোগতঃ পুরুষের মধ্যম উপকরণই রজঃ। রজোগুণ দুঃখাত্মক, চলনাত্মক (নিজে গতিমান) এবং উপষ্টম্ভক (অন্য দ্রব্যে গতি সঞ্চারক)। জগতের যাবতীয় দুঃখের কারণ হল প্রকৃতির রজোগুণ। সেরূপ সকল রকমের সক্রিয়তা ও চঞ্চলতার কারণও এই রজোগুণ। যেকোন কর্মপ্রচেষ্টা, চঞ্চলতা, উৎসাহ ও শক্তি—এই রজোগুণের লক্ষণ। সত্ত্ব ও তমোগুণ নিজে নিজে কোন কার্য করতে পারে না, এই রজোগুণই তাদের সক্রিয় করে তোলে।

রজোগুণের শোক প্রভৃতি বহুভেদ বা কার্য থাকলেও একে দুঃখাত্মক বলা হয়। রজোগুণের বৃদ্ধিতে লোভ, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব, বিষয়স্পৃহা প্রভৃতির উৎপন্ন হয়।[92]

অধর্ম ও আবরণের সম্বন্ধতঃ পুরুষের অধম উপকরণই তমঃ। তমোগুণ হল মোহাত্মক (মোহের সৃষ্টিকারী) গুরু ও আবরক (আবৃত করে রাখে)। গুরু ও

---

91 সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধংসত্ত্বমিত্যুত॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৪।১১

92 লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৪।১২

আবরক হওয়ার কারণে তমোগুণ সত্ত্বগুণের বিপরীত-ধর্মী। রজোগুণের চঞ্চলতার বাধা সৃষ্টি করে বলে এটি রজোগুণের বিপরীত ধর্মী। তমোগুণ সত্ত্বগুণের প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করে এবং রজোগুণের গতিকে বাধা দেয়। এটি বিষয় ও জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। তবে সত্ত্ব বা রজঃ যদি প্রবল হয়, তাহলে তমোগুণের বাধা অতিক্রম করেও তারা কার্য করতে পারে। তমঃ হতেই জড়তা, ঔদাসীন্য, বিষাদ, নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি জন্মে। এই কারণেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে যথাক্রমে শুক্লবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের সাথে তুলনা করা হয়।

তমোগুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি কার্য থাকলেও একে মোহাত্মক বলা হয়। তমোগুণের বৃদ্ধিতে বিবেক-ভ্রংশ, নিরুদ্যমতা, কর্তব্যের বিস্মরণ, মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয় প্রভৃতির উৎপন্ন হয়।[93]

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিনটি গুণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান। প্রতিটি গুণ সব সময় চেষ্টা করে যাতে অপর দুটি গুণকে পরাস্ত করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। অন্য দিকে আবার এই তিনটি গুণ এমনভাবে পরস্পর মিশ্রিত হয়ে থাকে যে, একটিকে অপর আরেকটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং গুণত্রয়ের সমবেত চেষ্টা ছাড়া কোন জিনিসের সৃষ্টি হতে পারে না। এদের সম্বন্ধ প্রদীপের তৈল, সলিতা (প্রদীপে ব্যবহৃত কাপড় বা তুলা) ও আগুনের সম্বন্ধের মত। তৈল, সলিতা এবং আগুন পরস্পর-বিরোধী হলেও যেমন একত্রে মিলিত হয়ে প্রদীপের আলো উৎপন্ন করে, তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় পরস্পর-বিরোধী হলেও একযোগে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে। আত্মা বা পুরুষ ব্যতীত জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, মানুষ ও পশু, পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সকল বস্তুতেই এই তিন গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তবে একটি গুণ অপর দুই গুণের উপর প্রাধান্য লাভ করতে চায় বলে কোন বস্তু বা ব্যক্তি সত্ত্ব প্রধান, কোনটা রজোপ্রধান, আবার কোনটা তমঃ প্রধান হয়। কিন্তু সবল হয়ে হোক বা দুর্বল হয়েই হোক, প্রতি বস্তুতেই এই গুণত্রয় বিদ্যমান আছে।

---

93 অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৪।১৩

প্রকৃতির গুণত্রয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এদের নিয়ত পরিবর্তনশীলতা। সৃষ্টিকালে গুণত্রয়ের বিরূপ পরিণাম এবং প্রলয়কালে স্বরূপ-পরিণাম হয়।

প্রকৃতির দুই অবস্থা;—সাম্য এবং বৈষম্য। প্রলয়ে সাম্য এবং সৃষ্টিতে বৈষম্য। প্রকৃতির পরিবর্তন এবং পরিণামে কোন ছেদ নেই। প্রলয়কালে সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, রজোগুণ রজে এবং তমোগুণ তমোরূপে পরিবর্তনশীল। সৃষ্টিকালে এই তিনটি গুণ কার্যোন্মুখভাবে পরিবর্তনশীল। তখন গুণের বৈষম্য অথবা তারতম্যবশত সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্ভব হয়। গুণসংমিশ্রণের অসংখ্য সংখ্যায় বা অনুপাতে বৈষম্য ঘটে এবং প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম হয়। প্রতিসর্গাবস্থায় গুণত্রয়ের সদৃশ-পরিণাম হয়। প্রলয় কালে প্রকৃতির সদৃশপরিণামের ফলে এইরূপ সাম্যবস্থা ঘটে। যে ক্রমানুসারে সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত ক্রমে লয় হয়।

প্রকৃতিকে ‘প্রধান’ও বলা হয়। এটি বিশ্বের আদিতত্ত্ব। এটি অব্যক্ত, নিত্য, জড়ায়ক এবং পরিণামী। প্রকৃতির গর্ভ থেকে যেসব বস্তু এবং পদার্থ উদ্ভূত হয় সে সমস্তই ব্যক্ত, অনিত্য, প্রকৃতির অনুমাপক, সংযোগী এবং পরাধীন। প্রকৃতি নির্বিশেষ জড়সত্ত্বা। এর সম্পর্কে নঞর্থক বিধেয়ই বেশী প্রযুক্ত হয়। প্রকৃতি সম্পর্কিত বিধেয়ের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

ব্যক্ত পদার্থের আবির্ভাব এবং তিরোভাব আছে। এই অর্থে ব্যক্ত পদার্থ মাত্রেই অনিত্য (অস্থায়ী)। অব্যক্ত প্রকৃতির আবির্ভাব এবং তিরোভাব নেই। এই অর্থে প্রকৃতি নিত্য।

প্রকৃতি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় সেসবের কিছুই কোন অবস্থায়ই প্রকৃতির বহির্ভূত নয়। প্রকৃতি সর্বাবস্থায় সৃষ্টিকে ব্যাপিয়া থাকে। সৃষ্ট কোন দ্রব্য সমস্ত প্রকৃতিকে ব্যাপিয়া থাকতে পারে না। মৃত্তিকা থেকে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয় সে-সমস্তেই মৃত্তিকা কোন না কোন অবস্থায় বর্তমান থাকে, কিন্তু মৃন্ময় বস্তুমাত্রেই সমস্ত মৃত্তিকাকে ধারণ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মৃত্তিকা দ্বারা কেবল কলস প্রস্তুত হয় না, পুতুল এবং আরও অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়। কলস সমুদয় মৃত্তিকাকে ব্যাপিয়া থাকলে, তা থেকে পুতুল প্রস্তুত হত না। মাতা সকল সন্তানকে ব্যাপিয়া থাকেন, কিন্তু কোন একটি সন্তান সে-অর্থে তাকে ব্যাপিয়া থাকে না, বা থাকতে পারে না। কার্য অব্যাপক, কারণ ব্যাপক।

মূল প্রকৃতির পরিণাম আছে, কিন্তু স্পন্দন নেই। পূর্ণের স্পন্দন অসম্ভব। আকাশেরও স্পন্দন আছে, কিন্তু আকাশ অপেক্ষা প্রকৃতি আরও পূর্ণ। তাতে স্পন্দনের অনুভব হয় না।

মূল প্রকৃতির কারণ নেই। সুতরাং, তা অনাশ্রিত। বিবর্তিত পদার্থ মাত্রই আশ্রিত।

প্রকৃতি নিজেই নিজের অনুমাপক নয়। প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে কার্য দ্বারা তার অনুমান করতে হয়।

প্রকৃতি পরাধীন নয়। প্রকৃতি পরবল দ্বারা আত্মপুষ্টি করে না, নিজেই নিজের কার্য উৎপাদন করে।

জড়শক্তিই জড়ের উৎপত্তির কারণ। অজড় জড়ে রূপান্তরিত হতে পারে না। অণু-পরমাণু এবং মৌলিক জড় উপাদানের দ্বারা বুদ্ধি, মন, অহং-এর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। অণু-পরমাণু পরস্পর বিক্ষিপ্ত এবং বহু। মূল একটি জড়াত্মক তত্ত্বে পৌঁছানো কাম্য। এই তত্ত্বটি প্রকৃতি।

প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ

প্রকৃতির স্বরূপ আমরা জানলাম। এই বিবর্তিত জগৎ যে প্রকৃতি নয় এতক্ষণে আমরা বুঝে গেছি। প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কিন্তু ঐরূপ প্রকৃতি যখন চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না, তবে তাকে আমরা স্বীকার করব কেন? ঐরূপ প্রকৃতি যে সত্য সত্যই আছে, তার প্রমাণ কি? আমরা এই স্থলে প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ করতে অগ্রসর হব। পরবর্তী অংশে প্রথম প্রশ্নের উত্তর খোঁজব। তাছাড়া মূল প্রকৃতি বলতে নিশ্চয় করে কি বোঝায়—এর আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হবে।

ব্যক্ত বস্তুমাত্রই সসীম, সাবয়ব, পরনির্ভর এবং আপেক্ষিক (শর্তাধীন)। সসীম কোন বস্তু, দ্রব্য কিংবা উপাদান এই বিরাট বিশ্বের কারণ হতে পারে না। ব্যক্ত কোন দ্রব্যই সর্বব্যাপী নয়। ব্যক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে ব্যবধান অনেক। এই হেতু নিখিল ব্যক্ত জগতের মূল কারণস্বরূপ অব্যক্ত, অসীম এবং নিত্য কোন কারণের অনুমান করতে হয়। ঐ অব্যক্ত কারণটিই প্রকৃতি।

গ্রিক দার্শনিক আনেক্সামিণ্ডার মনে করেন, জল, কিংবা বায়ু নয়, একটি নিঃসীম জড়সত্তাই সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ। সেই কারণটিই প্রকৃতি।

বুদ্ধির লক্ষণ 'অধ্যাবসায়', অহংকারের লক্ষণ 'অভিমান', গন্ধতন্মাত্রের লক্ষণ 'সূক্ষ্ম গন্ধ', পৃথিবী এবং তার ফুল-ফলের লক্ষণ 'স্থূল গন্ধ'। প্রত্যেক কার্যের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, কিন্তু এই বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম বর্তমান। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তিনটি মানসিক অবস্থা উদ্রেক করতে সমর্থ; সুখ, দুঃখ এবং মোহ। এই তিন প্রকার মনোভাবের উপাদান কারণ সত্ত্বঃ, রজঃ এবং তমঃ। এই তিনটি মৌলিক গুণ বা উপাদানের সমন্বয় শক্তিই এই জগতের মূল কারণ। এটিই প্রকৃতি।

কার্য-কারণের অন্তঃস্থিত শক্তি-সম্বন্ধের কারণেই কারণ কার্যে পরিণত হয়। যা কারণে অব্যক্ত থাকে তা কার্যের নামরূপে ব্যক্ত হয়। তিল থেকে তৈল হয়, বালুকা থেকে তৈল হয় না। তিলে তৈল উৎপাদন করার শক্তি আছে, বালুকাতে নেই। সমস্ত জগতের সম্ভাবনা এরূপভাবে প্রকৃতির গর্ভে অব্যক্ত থাকে। এই প্রকার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট অব্যক্ত শক্তির যুক্তিই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতি অস্তিত্ব বিশিষ্ট।

শক্তি-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কারণ এবং কার্যে অভেদ এবং ভেদ দুই-ই থাকে। একই কার্য-কারণ প্রক্রিয়ায় কার্য একটি ব্যক্ত অবস্থা এবং কারণ তার অব্যক্ত অবস্থা। সকল কার্যই ব্যক্ত হওয়ার কারণে পরিচ্ছিন্ন। কার্য নিজে তার কারণ হতে পারে না। সমস্ত কার্য প্রমাণ করে যে, জগতের একটি মূল কারণ আছে। সেটিই প্রকৃতি।

বুদ্ধি থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত জগতের সকল বস্ত্রই সসীম ও পরাপর নির্ভর। সুতরাং তাদের কোন অসীম ও স্বনির্ভর কারণ থাকবেই। সেই কারণই প্রকৃতি।

জগতের প্রতিটি বস্তুই মনে সুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপাদনে সক্ষম। সুতরাং এমন কোন সাধারণ কারণ আছে যার সুখ, দুঃখ ও বিষাদ, এই তিনটিকে উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে। সেই সাধারণ কারণই প্রকৃতি।

উৎপত্তির পূর্বে সকল কার্য উপাদান কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং জগৎরূপ কার্যই কোন একটি উপাদান কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। সেই উপাদান কারণই প্রকৃতি।

যে কোন কার্য কোন কারণ থেকেই উৎপন্ন হয়, সেই কারণ আবার আর একটি কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। এভাবে যেতে যেতে এমন একটি কারণে পৌঁছায়, যার আর কোন কারণ নেই। সেই কারণই প্রকৃতি।

কয়েকটি কার্যের পশ্চাতে যেমন একটি কারণ থাকে, তেমনি সমস্ত কারণের পশ্চাতে একটি মূল কারণ কাজ করে। বিশ্ব-রূপের এরূপ একটি অভিন্ন ঐক্যভাবই প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

শূন্য বা কিছু নেই—এরূপ ভাব থেকে কোনকিছু উৎপন্ন হতে পারে না। আমরা পূর্বেই জেনেছি, শক্তির কোন সৃষ্টি-লয় নেই, শুধুমাত্র পরিবর্তন হয়। এই যে দৃশ্যমান জগৎ—এটি এল কোথা থেকে? যদি না প্রকৃতি থেকে আসে, কারণ শূন্য থেকে তো আসতে পারে না। সুতরাং এই জগতের যে কারণ, সেটাই প্রকৃতি।

এখন অনেকের মনেই প্রশ্নের অবতরণ হতে পারে যে,—আপনি এই বিষয়ে (ত্রৈতবাদ) কি কোন শাস্ত্রবাক্য উদ্বৃত্ত করতে পারবেন? পাঠকের এই প্রশ্ন অমূলক নয়। চলুন দেখি, বৈদিক শাস্ত্রাদিতে এই বিষয়ে কি প্রমাণ উল্লিখিত আছে!

বেদে বৃক্ষ ও পক্ষীর উপমা দিয়ে এই বিষয়টিকে (ত্রৈতবাদ) খুব সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রন্থের প্রচ্ছদে "একটি বৃক্ষ দুইটি পক্ষী, একজন ভোক্তা অপরজন দ্রষ্টা"—এই বাক্যটি নিম্নোক্ত মন্ত্রেরই ক্ষুদ্র ভাব।

"ব্রহ্ম এবং জীবাত্মা উভয়ে পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন এবং ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবযুক্ত, চেতনা ও পালনাদি গুণরূপ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীর সদৃশ একই প্রকৃতিরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই উভয়ের মধ্যে একজন জীবাত্মা বৃক্ষরূপ সংসারের পাপ-পুণ্যরূপী কর্মফলকে ভোগ করে এবং অন্য পরমাত্মা ফল ভোগ না করিয়া কেবল জীবের কর্মকে সাক্ষীরূপে দেখেন।"[94]

---

[94] দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনগ্নন্যোৎঅভিচাকশীতি ॥—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০

উল্লিখিত মন্ত্রে জীবের দেহকে একটি বৃক্ষ বা প্রকৃতি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বৃক্ষ যেমন অল্পদিনেই বিনষ্ট হয়, সেরূপ প্রকৃতিরূপ দেহেরও অচিরেই বিনাশ ঘটে। বৃক্ষে সাধারণতঃ পক্ষীগণই বাস করে। জীবের দেহবৃক্ষেও জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দু'টি সুন্দর পক্ষীর আবাসস্থান। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্বদা একত্রযুক্ত। কেউ কাউকেও ছেড়ে থাকে না। জীব সর্বদা ঈশ্বরের আশ্রয়েই থাকে, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে জীব থাকতে পারে না। ঈশ্বরও সর্বদা জীবের সাথে যুক্ত হয়েই আছেন। উভয় উভয়ের সখা—জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ। উভয়েই এক দেহ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে যে দেহে অধিষ্ঠিত বলা হয়েছে তার কারণ হৃদয়াকাশই উভয়ের উপলব্ধি-স্থান। হৃৎ-পুন্ডরীক-রূপ আকাশে আত্মা উপলব্ধ হন, এই কারণে বলা হয়েছে যে, এরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দেহে অবস্থিত আছেন। কিন্তু জীব যখন নিজেকে ঈশ্বর থেকে আলাদা ভেবে 'আমি কর্তা' এই অভিমান হেতু সংসারের বিবিধ কর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঐ আসক্তিজনিত কর্মের ফল-রূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সুখই হোক, কি দুঃখই হোক সবই তার নিকট মিষ্ট বলে মনে হয়।

ঈশ্বর কর্মে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে কেবল দর্শন করেন। তিনি অধ্যক্ষরূপে অবস্থান করেন, কোনও কর্মে লিপ্ত হন না, সুতরাং তাঁকে সুখদুঃখরূপে কর্মফলও ভোগ করতে হয় না।

বেদ বলছে—"হে মনুষ্য! জন্মরহিত প্রকৃতি প্রলয়কালে নিজের রূপকে সংবরণ করে এবং সংসাররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রূপকে প্রকট করে। জ্ঞানী প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করে কিন্তু কুটিলস্বভাব পুরুষ জন্মমৃত্যুর পথে নানাভাবে বিচরণ করে।"[95]

এই মন্ত্রে জীবাত্মা ও প্রকৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এবার আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটি শ্রুতি দেখব।

[95] অজার পিশঙ্গিলা শ্বাবিৎ কুরুপিশাঙ্গিলা।
শশ আস্কন্দমর্ষত্যহিঃ পন্থাং বিসর্পতি ॥—যজুর্বেদ ২৩।৫৬

"এক অনাদি সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মক প্রকৃতি আপনার মত ত্রিগুণময় বহু প্রজা অর্থাৎ কার্যরূপ সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই প্রকৃতিকে এক অনাদি জীবাত্মা ভোগ করে এবং তাহাতে লিপ্ত হয়। কিন্তু অন্য এক অনাদি পরমাত্মা এই জীব দ্বারা ভুক্ত প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ তিনি এই প্রকৃতিতে না ত লিপ্ত হন এবং না ভোগ করেন।"[96]

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সৃষ্টিকে উৎপন্ন করে থাকে। জীব ভোগ করে, কিন্তু পরমাত্মা সৃষ্টিকে শুধুমাত্র দর্শন করেন, স্বাক্ষীস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই আদি বলিয়া জানিবে। তাহাদের বিকার এবং গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।"[97]

মূল প্রকৃতি তথা সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে স্বীকার কেন করব?

কার্যবস্তু কারণে বিদ্যমান থাকে অথচ কারণ থেকে আবির্ভূত হয়ে ভিন্নভাবে প্রতীত হয়। কার্যের তুলনায় কারণ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। মহৎ থেকে শুরু করে সকল কার্যবস্তু কমবেশি ব্যক্ত ও স্থূল। বলা হয় মহৎতত্ত্ব পরিমিত, অর্থাৎ মহৎতত্ত্বে পরিমাণ থাকার জন্য মহৎতত্ত্ব চরম অব্যক্ত হবে না। যে বস্তু পরিমিত, তার উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং মহৎ তত্ত্বের কারণরূপে পরম অব্যক্ত অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অহংকার অপেক্ষা মহৎতত্ত্ব অব্যক্ত হলেও প্রকৃতিই পরম অব্যক্ত। এইভাবে অনুমান প্রমাণের দ্বারাই মহৎতত্ত্বের তথা মহদাদি কার্যবস্তুর কারণরূপে পরম অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হয়।

যদিও জগৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তবুও জগতের বিচিত্র বস্তুর মধ্যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সমন্বয় শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমানরূপতা। যথা—পৃথিবী প্রভৃতি

---

[96] অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪।৫

[97] প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভাবান্॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩।১৯

মহাভূত, গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্র, অহংকার, মহৎ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হলেও এদের একটা সামান্যরূপ আছে। সেই সামান্য ধর্মই হল সুখদুঃখমোহস্বরূপতা। বুদ্ধি বা মহতের লক্ষণ হল অধ্যবসায়, অহংকারের লক্ষণ হল অভিমান, তন্মাত্রের লক্ষণ হল সূক্ষ্ম গন্ধ ইত্যাদি। পৃথিবী প্রভৃতির লক্ষণ হল স্থূলগন্ধ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি কার্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বা ধর্ম বর্তমান। এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট কার্য পরম্পরার একটি সাধারণ ধর্ম আছে। বস্তুমাত্রই আমাদের মধ্যে সুখ, দুঃখ অথবা বিষাদ উৎপন্ন করে। তাই সেই সাধারণ ধর্মটি হল সুখদুঃখমোহস্বরূপতা। এই সাধারণ ধর্মটি পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেকটিতে থাকায় সুখ-দুঃখ-মোহ স্বরূপত্ববিশিষ্ট অব্যক্তকারণ অবশ্য স্বীকার্য। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সমন্বিত উপস্থিতিবশতই এরূপ হয়ে থাকে। জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সমন্বয় ঘটে, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণান্বিত কোন একটিমাত্র বিশেষ কারণ থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতের এই বিশেষ কারণকেই প্রকৃতি বলা হয়।

কারণের শক্তি থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। কারণ যদি অশক্ত অর্থাৎ শক্তিহীন হয় তাহলে তার দ্বারা কার্য উৎপন্ন হয় না। যেমন তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয়, বালুকা থেকে তৈল উৎপন্ন হয় না। কারণ তিলে তৈল উৎপাদনের শক্তি আছে, বালুকাতে ঐ শক্তি নেই। শক্তি থাকলে কার্য হয়, শক্তি না থাকলে কার্য হয় না। এরূপ অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা শক্তি সিদ্ধ হয়। এই শক্তি স্বীকার না করলে কোন কার্যেরই উৎপত্তি সম্ভব নয়। এই জগতের সকল প্রবৃত্তিই শক্তির দ্বারা হয়ে থাকে। এভাবে কারণে যে শক্তি অবশ্যস্বীকার্য হয়, সেই শক্তি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়; কারণনিষ্ঠ ঐ শক্তি কারণে স্থিত কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। অর্থাৎ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ, সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চয়ই সৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন কোন এক অব্যক্ত কারণে সুপ্তাবস্থায় ছিল। যে অব্যক্ত শক্তির এই বৈচিত্র্যময় জগতের অধিষ্ঠান হবার যোগ্যতা আছে, তাই প্রকৃতি।

আবার কারণ ও কার্যের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদ বর্তমান। স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার যেমন স্বর্ণ থেকে অভিন্ন, তেমনি আবার আকৃতিপ্রাপ্ত অলংকার হিসেবে তা উপাদান স্বর্ণ থেকে ভিন্ন। পরিণামপ্রাপ্ত জগতের সকল বিষয়ের সঙ্গে যে

উপাদান কারণ একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্নরূপে বর্তমান, তাই প্রকৃতি। যেহেতু কারণ থেকে কার্যের বিভাগ হয় অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয় ও ভিন্নরূপে প্রতীতি হয়, সেহেতু চরম কারণ অব্যক্ত অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই অব্যক্তই প্রকৃতি।

বৈশ্বরূপ্য এবং বিশ্বরূপ একই অর্থ বহন করে। বিশ্বরূপ শব্দের অর্থ কার্যসমূহ। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন ঘট যখন বিনষ্ট হয়, তখন ঐ ঘট মৃত্তিকাতে প্রবেশ করে এবং অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই মৃত্তিকা অব্যক্ত হলেও তার অব্যক্ত হওয়া আপেক্ষিক। একমাত্র প্রকৃতিই প্রকৃত অব্যক্ত। প্রকৃতি কখনও কোথাও প্রবিষ্ট বা তিরোভূত হয় না। সেই কারণে প্রকৃতি সকল কার্যের চরম অব্যক্ত। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে নিজের উপাদান কারণে কার্যের বিদ্যমান থাকা এবং বিনাশের পর কার্যের নিজের উপাদান কারণে লীন হওয়া,—উভয়ই অব্যক্ত অবস্থা। অতএব, বিশ্বরূপ যে অধিষ্ঠানে প্রলয়কালে বিলীন হয় এবং যে অধিষ্ঠান থেকে বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়, সেই অধিষ্ঠানই হল প্রকৃতি।

এই প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণত্রয়স্বরূপ, কারণ রহিত, নিত্য, ব্যাপক, নিয়ত বা নির্দিষ্ট ক্রিয়াহীন বা স্পন্দাদি ক্রিয়াহীন, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতির বা নিজের অনুমাপিকা নয়। এই প্রকৃতিই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিখিল কার্যের উপাদান হয়।

কারণের গুণ থেকে কার্যের গুণ আবির্ভূত হয়, কারণ যেরূপ গুণসম্পন্ন হয়, কার্যও সেরূপ গুণসম্পন্ন হয়। তন্তু শুক্ল হলে তার থেকে উৎপন্ন বস্ত্রও শুক্ল হয়, সেরূপ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক মহদাদি কার্যেরও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক কারণ থাকা আবশ্যক। সেই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক যে কারণ তাই মূল কারণ প্রকৃতি।

মহতত্ত্ব থেকে পৃথিবী পর্যন্ত কার্য গুলোর অব্যক্ত নামক মূলকারণ আছে। কেননা, ঘটাদি নানাবিধ কার্যবর্গের কারণের সাথে বিভাগ ও অবিভাগ—এই উভয়ই আছে। উৎপত্তির পূর্বের কারণে কার্য থাকে এরূপই নিয়ম, অতএব যেরূপ মস্তকাদি অবয়বসমূহ কুর্মশরীর থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে, এই অবস্থায় এটা কুর্মের শরীর, এই সমস্ত তার অবয়ব এরূপ বিভক্ত ব্যবহার হয়। সেরূপ কুর্মের অবয়ব সকল কূর্মশরীরে প্রবেশ করতঃ তাতে অব্যক্ত হয়, অর্থাৎ তখন কুর্ম শরীর থেকে তার মস্তকাদি অবয়ব বিভক্ত দৃষ্ট হয় না। এরূপ ঘট, কুণ্ডল ও মুকুটাদি কার্য সকল

মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণপিণ্ডরূপ কারণে থেকেই আবির্ভূত হয় বলে বিভক্তরূপে ব্যবহার হয়।

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতও শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র থেকেই আবির্ভূত হয়ে বিভক্ত হয়। পঞ্চতন্মাত্র নিজের কারণ অহঙ্কারে থেকেই আবির্ভূত হলে বিভক্ত ব্যবহার হয়। অহঙ্কার স্বকারণ মহতত্ত্বে থেকেই আবির্ভূত হলে বিভক্ত ব্যবহার হয়। মহতত্ত্ব স্বকারণ পরম অব্যক্তে থেকেই আবির্ভূত হলে বিভক্ত ব্যবহার হয়। এরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে অবস্থিত কালের বিভাগ হয়ে থাকে। আবার প্রলয়কালে ঘট কুণ্ডল মুকুটাদি কার্য মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডরূপ কারণে বিলীন হয়ে অব্যক্ত হয় অর্থাৎ কার্যকে অপেক্ষা করে কারণ অব্যক্ত এবং কারণকে অপেক্ষা করে কার্য ব্যক্ত। অর্থাৎ কারণ কার্যরূপে ব্যক্ত হয় আর কার্য কারণরূপে অব্যক্ত হয়। অর্থাৎ যখন ঘট মুকুটাদি কার্য লীন হয়ে মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডরূপে পরিণত হয় তখন আর মৃৎপিণ্ডাদি কারণ ঘটাদি কার্যরূপে ব্যক্ত থাকে না, সুতরাং তখন অব্যক্ত বলে। এভাবে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম ভূতে প্রবেশ করে নিজেকে অপেক্ষা করে তন্মাত্রকে অব্যক্ত করে, তন্মাত্র-পঞ্চক অহঙ্কারে প্রবেশ করে অহঙ্কারকে অব্যক্ত করে, অহঙ্কার মহতত্ত্বে প্রবেশ করে মহতত্ত্বকে অব্যক্ত করে। উক্তরূপে প্রকৃতির কোথাও বিলয় নেই। কারণে ব্যক্ত থেকে কার্যের বিভাগ ও অবিভাগ হয় বলেই মূল কারণ পরম অব্যক্ত সত্তামাত্রবশিষ্ট,—এরূপ বুঝতে হবে। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে মহদাদি কার্য যা-তে অনভিব্যক্ত থেকে সৃষ্টিকালে যা হতে আবির্ভূত হলে বিভক্ত বলে কথিত হয় এবং প্রলয়কালে যা-তে অব্যক্তরূপে লীন হয় সেটাই পরম অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি।

মহদাদি পৃথিবী পর্যন্ত কার্যসকল পরিমিত, যারা পরিমিত তাদের অব্যক্ত কারণ আছে। যেমন পরিমিত ঘটাদির অব্যক্ত কারণ মৃতপিণ্ড ইত্যাদি। মহদাদি কার্য সকল সুখ-দুঃখ-মোহ-সমনুগত, অতএব নিশ্চয়ই তাদের সুখাদি স্বভাব অব্যক্ত কারণ আছে। যে কারণে অব্যক্ত ভাবে যে কার্য থাকে সেই কারণ থেকেই সেই কার্যের আবির্ভাব হয়। মহদাদি সৎকার্যসকল যা-তে অনভিব্যক্ত ভাবে অবস্থান করে আবির্ভূত হয়, সেটা পরম অব্যক্ত। কার্য্য সকলের স্ব স্ব কারণ থেকে বিভাগ ও অবিভাগ এই উভয়ই দেখা যায়। যে সময় কারণ থেকে কার্য নিঃসৃত বা

আবির্ভূত হয় তখন বিভক্ত বলে ব্যবহার হয় এবং যখন কারণে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে বা লীন থাকে তখন অবিভক্ত বলে ব্যবহার হয়। মহাদাদি কার্য যে কারণ থেকে উক্ত ভাবে বিভক্ত হয় এবং যা-তে লীন হয়ে অবিভক্ত হয় সেটাই পরম অব্যক্ত, প্রধান বা মূল প্রকৃতি।

কারণ এবং কার্যের মধ্যে গুণগত এবং পরিমাণগত পার্থক্য হেতু বিভিন্ন কার্যের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা সত্ত্বেও মূলত একই উৎসের কারণে কিছু সাধারণ সমন্বয় থাকে। কারণ এবং কার্যের মধ্যে বস্তুত একটি শক্তি-সম্বন্ধের প্রবণতার কারণে কারণ এবং কার্যের বিভিন্নতা ও ক্রমশ সূক্ষ্মতর কারণের অভিন্নতা হেতু প্রমাণ করে যে, সমস্ত জড়শক্তির মূল উৎসস্বরূপ এবং সমস্তপ্রকার গুণ তথা সুখ, দুঃখ এবং মোহের সমন্বয়স্বরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রকৃতির স্বীকার অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রকৃতিতে স্বীকার করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

আমরা সত্তাত্রয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের স্বীকার করলাম, কিন্তু তাদের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক কি, তা এখনও জানতে পারলাম না। এজন্য পরবর্তী অংশে এই সত্তাত্রয়ের সম্বন্ধ নিয়েই আলোচনায় প্রবুদ্ধ হব।

প্রকৃতির সাথে অন্য দুইটি অনাদি সত্তার (ঈশ্বর এবং জীবাত্মা) সম্বন্ধ কী?

পূর্বেই কথিত হয়েছে, প্রত্যেকটি কার্যের তিনটি কারণ থাকে। (১) কর্তা, (২) কর্ম এবং (৩) কার জন্য! এগুলোই যথাক্রমে নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, সাধারণ কারণ। সহজভাবে বোঝালে, একটি সোনার গহনা প্রস্তুত করাকে যদি কার্য ধরি, তবে স্বর্ণকার গহনাটির নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ হল সোনা এবং সাধারণ কারণ হল যিনি এই গহনাটি পড়বেন।

ত্রৈতবাদমতে সাধারণ কারণ হল জীবাত্মা। কারণ ঈশ্বর নিজে এই জগৎকে ভোগ করেন না। সুতরাং জীবের ভোগের নিমিত্তই এই জগতের সৃষ্টি।
সূত্র—তদর্থ এব দৃশ্যস্যাহত্মা। (যোগদর্শন ২/২১)

শব্দার্থ—(তদ্-অর্থঃ) ওই জীবাত্মার ভোগ এবং অপবর্গের জন্য (এব) অবশ্যই (দৃশ্যস্য) দৃশ্যের (আত্মা) স্বরূপ হয়।

সূত্রার্থ—দৃশ্যের স্বরূপ জীবাত্মার ভোগ ও অপবর্গকে সিদ্ধ করার জন্য হয়।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রে দৃশ্যের কী প্রয়োজন; সেই বিষয়ে বলা হয়েছে এই দৃশ্যের রচনা ঈশ্বর, যাতে জীবাত্মা ভোগ এবং অপবর্গ রূপ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে পারে সেই জন্য করেছেন। এই সংসারে তিনটি পদার্থ রয়েছে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। ঈশ্বর সকল কামনা হতে রহিত; তাই তাঁর কাছে এই দৃশ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি একটি জড়পদার্থ হওয়ায় সে নিজেকে স্বয়ং ভোগ করতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মার নিজস্ব কোন আনন্দ না থাকায় সে এই দৃশ্যকে ভোগ করে।

[যোগদর্শন ভাষ্য, আচার্য্য কপিল আর্য]

সুতরাং প্রকৃতির সাথে জীবাত্মার ভোগ্য-ভোক্তার, ঈশ্বরের সাথে কর্তা-কর্মের সম্বন্ধ।

প্রকৃতির পরিণাম বিষয়

প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল। সৃষ্টিকালে প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিরূপ পরিণাম এবং প্রলয়কালে স্বরূপ-পরিণাম হয়। প্রকৃতির কার্য ঈশ্বর দ্বারা সম্পাদিত; তিনিই কর্তা। জগৎ এবং বিষয় নিষ্ঠ অন্তঃকরণ, দেহ-মন নিয়ে আমাদের অবভাষিক অস্তিত্ব সবই প্রকৃতির পরিণাম। বিবর্তনের ফলে এইরকম অনেক জগতের এবং জীবের সৃষ্টি হয়েছে। সে-সব লুপ্ত হয়ে আবার নতুন সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি অফুরন্ত শক্তির উৎসর্গ (বিবর্তন) এবং প্রলয় পালাক্রমে অনুভূত হয়।

প্রকৃতির দুই অবস্থা, সাম্য এবং বৈষম্য; প্রলয়ে সাম্য এবং সৃষ্টিতে বৈষম্য। প্রকৃতির পরিবর্তন এবং পরিণামে কোন ছেদ নেই। প্রলয়কালে সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, রজোগুণ রজে এবং তমোগুণ তমোরূপে পরিবর্তনশীল। সৃষ্টিকালে এই তিনটি গুণ কার্যোন্মুখভাবে পরিবর্তনশীল। তখন গুণের বৈষম্য অথবা তারতম্যবশত সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্ভব হয়। গুণসংমিশ্রণের অসংখ্য সংখ্যায় বা অনুপাতে বৈষম্য

ঘটে এবং প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম হয়। যে ক্রমানুসারে সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত ক্রমে লয় হয়।

জগৎ এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের মূল কারণ হল প্রকৃতি। প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করে এবং পরে এই প্রকৃতি থেকেই ক্রমে ক্রমে জগতের বিচিত্র অভিব্যক্তি হয়। এখন প্রশ্ন কখন এবং কীভাবে জগতের এই অভিব্যক্তি সম্ভব হয়! জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে জগৎ অব্যক্ত থাকলেও, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান না ঘটলে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। প্রকৃতি এবং পুরুষের যখন সংযোগ ঘটে তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান ঘটে এবং জগতের অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। সুতরাং জগতের অভিব্যক্তির জন্য প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ নিতান্তই প্রয়োজন।

প্রকৃতি অচেতন ও বোধশক্তিহীন হওয়ার কারণে সচেতন ও বুদ্ধিমান সত্তার নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে তার কাজ করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে পুরুষ সচেতন এবং বুদ্ধিমান হলেও নিজে নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে পুরুষদের পক্ষেও জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুতরাং তৃতীয় সত্তা ঈশ্বরের দ্বারাই জগতের অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। আর একটি প্রশ্ন! প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হওয়ার কারণে তারা নিজেদের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে কিনা! প্রকৃতি এবং পুরুষ তাদের মিলনের ফলে উভয়ে উভয়ের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। পুরুষের প্রকৃতিকে প্রয়োজন ভিন্ন সত্তাকে জানার জন্য, নিজের ভোগের জন্য, এবং নিজের মুক্তির জন্য। প্রকৃতিই পুরুষের বন্ধনের কারণ, আর বন্ধন ব্যতীত মুক্তির প্রশ্নই উঠে না। পক্ষান্তরে প্রকৃতিরও পুরুষকে প্রয়োজন, পুরুষ কর্তৃক পুষ্ট ও ভোগ্য হওয়ার জন্য।

প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ ঘটলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ব্যহত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। রজোগুণ স্বভাবত চঞ্চল; তাই রজোগুণ ই প্রথমে সক্রিয় হয় এবং পরে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রকৃতিস্থিত প্রত্যেকটি গুণ অপর জন দুটির উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে, ফলে জগতের অভিব্যক্তি ঘটে।

এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া কোন প্রথম ঘটনা নয়। প্রকৃতি জড়, অচৈতন্য ও অবিবেকী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যহীন নয়। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ বা মুক্তিই জন্যই প্রকৃতির অভিব্যক্তি। প্রকৃতি এবং তার পরিণামকে পুরুষেরাই ভোগ করে। ঈশ্বরকে জেনে এবং প্রকৃতি ও তার পরিণাম থেকে পুরুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি তথা সত্তাত্রয় ভিন্ন—এরূপ জানতে পারলে তার মুক্তি হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রৈতবাদ ও সৃষ্টিরহস্য

ঈশ্বর ও জগৎ

আমরা পূর্বের তিন অধ্যায়ে যা বলেছি, তা থেকেই প্রতীয়মান হবে যে ঈশ্বরই বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকার্য কি ঈশ্বরের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, অথবা তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টির প্রণালী ও পরিণাম কি এবং তার সাথে ঈশ্বরের চিরন্তন সম্বন্ধ কি?

ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি কখনও সর্ব্বগুণান্বিত অনন্ত হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর ও সৃষ্টি দুই সর্বগুণান্বিত অনন্ত সত্তা কখনও এককালে বর্তমান থাকতে পারে না। এমন কি, একক্ষেত্রব্যাপী অনন্তেরও সৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বর নিজেই সকল ক্ষেত্র অনন্তরূপে পূর্ণ করে অবস্থান করছেন, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় একদেশব্যাপী অনন্তের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পরমেশ্বর অখণ্ড, অবিভাজ্য পরমাত্মা। তাঁর কোন অংশ নেই এবং তিনি নিত্য পূর্ণ। বিশ্ব অথবা মানব তাঁর অংশ নয়। যারা বলেন মানব ও বিশ্বের যাবতীয় ক্ষুদ্র পদার্থ ঈশ্বরের অংশ, তারা পরমাত্মার স্বরূপ বুঝতে পারেন নি। পরমাত্মা এক, তার কোন অংশ থাকতে পারে না। দ্বিতীয় অনন্তসত্তার সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বর যেমন অনন্ত, সর্বাবস্থাতেই তিনি সেরূপ অনন্ত ও অনিঃশেষিত থাকেন। সৃষ্টবস্তু সমস্তই তাঁর মধ্যে বর্তমান থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর আশ্রয়েই জীবিত থাকে, কারণ তাঁর বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। এইজন্য সৃষ্ট বস্তু সকলের আশ্রয় ও আধার তিনি। কিন্তু কোন সৃষ্ট পদার্থ একক বা সমষ্টিভাবে ঈশ্বর হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর অনন্ত ও পূর্ণ, সৃষ্ট পদার্থ ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ। অতএব সৃষ্টি ঈশ্বর দ্বারা উৎপন্ন এবং ঈশ্বরে আশ্রিত ও সঞ্জীবিত থাকলেও ঈশ্বর থেকে ভিন্ন।

বর্তমানে যে বিশ্ব আমরা দেখছি তার আদি আছে, কিন্তু তা যত অতীতেই হোক, তারও পূর্বে সৃষ্টি স্তব্ধ ছিল না। মানুষে মৃত্যু হলেও যেমন তার সাধারণ প্রকৃতি সন্তানের মধ্যে বর্তমান থাকে এবং এভাবে তা বংশের পর বংশ প্রবাহিত হয়, সেরূপ ভিন্ন ভিন্ন কালে একটির পর একটি করে যে সকল নতুন নতুন সৃষ্টি

হয়েছে, সে সকল একই প্রকৃতিবিশিষ্ট। অপ্রধান বিষয়ে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু সকলেরই আদর্শ, উৎপত্তি, বিধি, ইতিহাস ও পরিণাম এক—মূল প্রকৃতি। যে কালেরই সৃষ্টি হোক, তা বর্তমান কালের সৃষ্টি থেকে ভিন্ন আকারের নয়। কারণ পরমেশ্বর একই নিয়মে প্রতি কালে বা কল্পে সৃষ্টি করে থাকেন।

কল্পে কল্পে যে সৃষ্টি প্রবাহিত হচ্ছে, তার ধর্ম উন্নতি ও বিকাশ। তার মধ্যে আমরা পরিবর্তন ও বিনাশ দেখতে পাই বটে, কিন্তু তা নবতর ও উন্নততর বিকাশের উপায়। উদাহরণ স্বরূপ, ফুল যখন ঝরে পড়ে, তখন তার ঝরে পড়া শত শত বৃক্ষ ও অসংখ্য নব নবতর পুষ্পের জন্মের কারণ হয়। কি জড়, কি জীব, সকলের মধ্যেই কালপ্রবাহে, এমন কি পরিবর্তন ও মৃত্যুর পরিণামেও, এই উন্নতি ও বিকাশের বিধি দেখা যায়। কিন্তু বিকাশ বললেই তার মধ্যে একটি লক্ষ্য, পূর্ণতা, আদর্শ, চরম গতি থাকে। এটি প্রতি বিষয়ে চক্ষুর অগোচরে থেকে বিকাশের রূপ ও পথ নির্দেশ করে। বৃক্ষ ও জীবশরীরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয়ের আদর্শ অন্তরে প্রচ্ছন্ন থেকে বিকাশের রূপ ও পথ নিয়ন্ত্রণ করে দেয়। বিশ্বের চির পরিবর্তন ধারার মধ্যেও এরূপ একটি আদর্শ আছে, যা তাকে আপন পথে নিয়ন্ত্রণ করছে। কার্যকারণ শৃঙ্খলা ও অকস্মাৎ সংযোগ-বিয়োগ দ্বারা বিশ্বের উন্নতি ও বিকাশ ব্যাখ্যা হয় না। মানবাত্মার মধ্যেও এরূপ একটি আদর্শ আছে, যা অনুভব করে মানুষ আপন জীবন নিয়মিত করে বিকাশ ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে চায়। মানবের এ আদর্শ স্বতঃই অনন্ত বলে আদর্শ সম্বন্ধে মানব বিশ্বের সমকক্ষ। কিন্তু জড় ও জীব বিশ্বের অঙ্গ এবং তাদের ক্ষুদ্র আদর্শ বিশ্বের মহান আদর্শের সাথে যুক্ত এবং তারই অঙ্গ। বিশ্বের আদর্শ জড় ও জীবকে কেবল জীবিত রাখে, তা নয়,—বিনাশ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও স্বকীয় আদর্শের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই আদর্শ কালাতীত ও চিরবর্তমান এবং জড় ও জীবের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শ তার অঙ্গীভূত। এটা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, বাইরে পরিণত হলেও বিনষ্ট হয় না এবং যথাকালে অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। প্রতি জীবের অন্তরে এবং প্রতি ক্ষুদ্র আদর্শের অন্তরালে তা

বর্তমান রয়েছে। কালাধীন সৃষ্টির মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল আছে, কিন্তু এই পূর্ণ আদর্শ চির বর্তমান।

সৃষ্টিতে ত্রৈতবাদ

আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা এখন জেনেছি, বিগ ব্যাংয়ের ফলেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রুশবিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান প্রমাণ করেন মহাবিশ্বের প্রতিটা বস্তু পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে, তার দূরে সরে যাওয়ার গতি তত বেশি। অর্থাৎ মহাবিশ্ব সবসময় প্রসারিত হচ্ছে।

মহাবিশ্ব সত্যি সত্যিই প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু কেন? বিজ্ঞানীদের মাথায় এল তখন নতুন ভাবনা। যেহেতু মহাবিশ্বের প্রতিটা গ্যালাক্সি একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যাচ্ছে, তার মানে এরা একসময় একসঙ্গে ছিল,—অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা। সেখান থেকে কোন এক বিস্ফোরণে এরা চারপাশে ছুটে যায়। অনেকটা বোমা বিস্ফোরণের মত ঘটনা,—যেটা প্রকৃতির বৈষম্যের সূত্র। বিস্ফোরণের পর বোমার ভেতরের পদার্থ যেগুলোকে আমরা স্প্লিন্টার বলি, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে মহাবিশ্বেও কি এমন কোনো ঘটনা ছিল? মহাবিশ্ব কি আগে একটাই বিন্দু ছিল, সেই বিন্দুতেই ঘটে বিস্ফোরণ। আর সেই বিস্ফোরণের পরেই জন্ম হয় বস্তুকণার, সময়ের বিবর্তনে সেসব বস্তু গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মতে, একটা সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দু থেকে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মহাবিস্ফোরণের জন্ম, তেমনি জন্ম স্থান ও কালের।

মহাবিস্ফোরণ মেনে নিতে কারও অসুবিধা নেই, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত। সমস্যা হল সেই বিস্ফোরণের আগে তা হলে কী ছিল? এ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই এটাকে অবান্তর প্রশ্ন বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। তাঁদের মতে, মহাবিস্ফোরণের আগে সময় বলে কিছু ছিল না। আর সময়ের অস্তিত্বেই

যেখানে নেই, সেখানে কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না। তাই বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ছিল, সে প্রশ্ন তোলাই ঠিক নয়।

কিন্তু যে কোনো যৌক্তিক প্রশ্ন তোলার অধিকার সবার আছে। বর্তমান হল অতীতের বিভিন্ন ঘটনার ফলাফল। একটা ঘটনার ফলাফল জন্ম দেয় আরেক ঘটনার। মহাবিশ্বের ইতিহাসের পেছন দিকে হাঁটলেই ঘটনার পরম্পরা দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের একটা ঘটনা বর্তমানের কোন ঘটনার কারণ। তেমনি অতীতের কোন না কোন ঘটনার ফলাফল হল বর্তমানের কোনো ঘটনা।

তাই বলা নেই কওয়া নেই, সময়ের বালাই নেই, হঠাৎ করে কোন একটা ঘটনা ঘটে গেল? সবচেয়ে বড় কথা আমরা যেটাকে শূন্যস্থান বলি, বা মহাশূন্য বলি, এগুলোর অবস্থান আমাদের এই মহাবিশ্বের মধ্যেই। তাই বিগ ব্যাংয়ের আগে যখন কিছুই ছিল না। তখন কী শূন্য-মহাশূন্য বলে কিছুই ছিল না? স্পেস বা স্থানই যদি না থাকে, তা হলে মহাবিস্ফোরণ ঘটল কোথায়?

শুধু মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বই নয়। এখন এর পাশাপাশি আরও দুটি তত্ত্ব দাঁড়িয়ে গেছে। ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব। তবে এটি মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সঙ্গে হাত ধরাধরি করেই চলছে। আরেকটি হলো বিগ বাউন্স। দুটি তত্ত্বই মহাবিশ্বের সৃষ্টি আর বিকাশের কথা যেমন বলছে, বলছে মহাবিস্ফোরণের আগের কথাও।

ইনফ্লেশন তত্ত্ব আসলে মহাবিশ্বের মহাস্ফীতির কথা বলে। মহাবিশ্বের জন্মের $১০^{৩০}$ সেকেন্ডের মধ্যে মহাবিশ্ব $১০^{৩৬}$ গুণ স্ফীত হয়ে ওঠে। আসলে এটাই এ তত্ত্বের শেষ কথা নয়। স্ফীতি তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসে মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের ধারণা। স্ফীতি তত্ত্বের জনক আল্যান গুথ গত শতাব্দীর আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্ফীতি তত্ত্ব আজ জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত এক তত্ত্ব।

সমাধান যাই হোক, বিগব্যাংয়ের আগে কী ছিল সেটা এক মস্ত প্যারাডক্স। এই প্যারাডক্সের সমাধানার্থই এগিয়ে আগে প্রকৃতি। অনেক বিজ্ঞানীই এখন বলেন, এর আগে আরেকটা মহাবিশ্ব ছিল, সেটা সংকুচিত হয়ে সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছায়।

একই কথা বলছে পবিত্র বেদ—"জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই পরমাত্মাকে জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন যার মধ্যে এই সমগ্র জগৎ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাঁর মধ্যেই এই সমগ্র জগৎ একত্রে মিলিত হয় এবং তাঁর মধ্যে হতেই তা বিছিন্ন হয়।"[98]

অর্থাৎ তাঁর মধ্য হতেই বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগৎ সৃষ্টি হয়, আর তাঁর মধ্যেই অন্তে সংকুচিত হয়ে সমগ্র জগৎ আবার মিলিত হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—"হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এক এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে এবং এই জন্যই জগৎ বারবার আবর্তিত হয়।"[99]

তা হলেও প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়,—এই সৃষ্টিচক্রের শুরু কোথায়?

মনে আছে পাঠক, বলেছিলাম মূল প্রকৃতির কোন কারণ নেই,—সেটি অকারণ ও অনাদি। অকারণ এজন্য যে,—কারণ রহিত না হলে তাকে মূল বলা যায় না। এই প্রকৃতিই সেই কারণ বা পরম বিন্দু,—যা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু এটি কি প্রসারিত হতেই থাকবে? না। স্টিফেন হকিং তাঁর "A Brief History ot Time" গ্রন্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি নিয়ে বলেছেন,—"সম্প্রসারণমান এই জগৎ একসময় আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে। সংকুচিত হতে হতে আবার সেই আগের ন্যায় এক বিন্দুতে (মূল প্রকৃতিতে) পরিণত হবে।" সবকিছু আবার যাতে পরিণত হবে যার নাম তিনি দিয়েছেন Big Crunch বা মহা সংকোচন। বৈদিক দর্শনে সেটাই মূল প্রকৃতি। অনাদি হওয়ার কারণে তার লয় বা সৃষ্টি হয় না।

উল্লেখ্য, বিগ ব্যাং-ই শেষ কথা নয়। সে বিষয়ে নোবেলজয়ী অধ্যাপক রজার পেনরোজ বলেন,—"বিগ ব্যাং আমাদের মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং অন্য একটা সৃষ্টিকল্পের শেষ।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে শক্তির বলে বিগ ব্যাং হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় আগের কোন শক্তি নিহিত ছিল। বৈদিক মতে সেই শক্তিই প্রকৃতি।

---

[98] বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্রবিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।
তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতু সর্বেং স আতঃ প্রোতশ্চ বিভু প্রজাসু॥—যজুর্বেদ ৩২।৮

[99] ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচম।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ বিপরিবর্ততে॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।১০

অর্থাৎ বিগ ব্যাং এরকম অসংখ্যবার হয়ে চলেছে এবং নতুন মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। অথচ এই বিষয়টি প্রতি সন্ধ্যাকালে সনাতনীগণ চিন্তন করেন। কারণ আমরা সন্ধ্যোপাসনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র সহ এর অর্থ চিন্তন করে থাকি। মন্ত্রটি এই—

ওওম্ সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥[100]

অর্থাৎ পরমাত্মা যেভাবে পূর্ব কল্পে সূর্য, চন্দ্রাদি, প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং আকাশের মাঝে লোক-লোকান্তর (গ্রহ, নক্ষত্রাদি) রচনা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই বর্তমান কল্পেও রচনা করেছেন।

সৃষ্টিতে প্রকৃতির বিশেষত্ব আমরা পেলাম। এখন সৃষ্টিতে ঈশ্বর ও জীবাত্মার স্থান কোথায়,—তা-ই প্রতিপন্ন করতে হবে।

তিন কারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই জেনেছি,—যেখানে প্রকৃতি উপাদান, জীবাত্মা সাধারণ ও ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ নির্দেশিত হয়েছে। প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ঈশ্বর নিমিত্তরূপেই এই কার্য সম্পাদন করেছেন। তা না হলে জড় প্রকৃতির সামর্থ্য নেই যে, সে নিজে নিজেই পরিবর্তিত হবে।

সৃষ্টি হল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হল। কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি বিনা কারণেই সৃষ্টি হয়েছে? কারণ ছাড়া কার্য অসম্ভব। সুতরাং সেই কারণ জীবাত্মা,—যার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি। যদি এই জগতে জীবাত্মা না থাকত একে ভোগ করত কে?

জীবাত্মা ও প্রকৃতি কী ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল, না কি তারা স্বাধীন?

এতক্ষণে আমরা পরিষ্কারভাবেই বুঝেছি ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি; তিনটিই অনাদি। এরপরও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। এই সত্তাত্রয় অনাদি হলে জীবাত্মা ও প্রকৃতি কি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল, নাকি তারা স্বাধীন?

---

[100] ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩

প্রকৃতি জড় ও অচেতন। অচেতন হওয়ার কারণে প্রকৃতি স্বয়ং পরিবর্তিত হতে পারে না। যেরূপ মৃত্তিকাখণ্ড কারও কর্ম ব্যতীত স্বয়ং কলসীতে পরিণত হতে পারে না, কারণ মৃত্তিকাতে এমন ক্ষমতা নেই। সেরূপ প্রকৃতির মধ্যেও এমন ক্ষমতা বা শক্তি নেই, যে সে স্বয়ং জগতে পরিণত হবে। প্রকৃতি জীবাত্মার ভোগ্য হওয়ার কারণে তার দ্বারাও জগৎ নির্মাণ সম্ভব নয়। কারণ ভোক্তা নিজে ভোগ্য হতে পারেন না। সুতরাং তাদের আরেকটি সত্তার (ঈশ্বর) উপর নির্ভরশীল হতেই হবে।

অচেতন প্রকৃতি জীব এবং জগতের মূল কারণ হলে তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য এবং উপায়ের যথাযথ সমন্বয় হতে পারে না। প্রকৃতির নির্দিষ্ট কোন্ কার্যটি পুরুষার্থের পক্ষে সহায়ক হবে, কোন্ কার্যটি তদনুকূল হবে না, অচেতন প্রকৃতির পক্ষে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। জীবাত্মাও অল্পজ্ঞ ও একদেশী বলে জগৎ নির্মানের কার্য তার দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং জগৎ নির্মানের জন্য জীবাত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতি-পুরুষের (জীবাত্মা) সংযোগের ফলে জগতের অভিব্যক্তি এবং বিয়োগের ফলে জগতের বিনাশ হয়। কিন্তু প্রকৃতি এবং পুরুষ বিরুদ্ধধর্মী। উদাহরণস্বরূপ—প্রকৃতি অচেতন, আর পুরুষ সচেতন। প্রকৃতি এবং পুরুষ বিরুদ্ধধর্মী হওয়ার কারণে তাদের সংযোগ বা বিয়োগ তাদের স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে না। সুতরাং সচেতন, সর্ব-শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সাহায্যে এই সংযোগ বা বিয়োগ সম্ভব হয়েছে—এরূপ স্বীকার করতে হবে। অতএব জীবাত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবাত্মা ও প্রকৃতি অনাদি হলেও তারা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন আসবে, ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি; তিনটি অনাদি সত্তা এবং জগতের কারণ হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরকেই কেন সৃষ্টিকর্তা বলা হয়? প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে স্বয়ং পরিবর্তিত হতে পারে না, এটা ঠিক। কিন্তু জীবাত্মা তো চেতন, তাকে সৃষ্টিকর্তা মেনে গ্রহণ করলে ক্ষতি কী?

"অধিষ্ঠাতা চেতনই হইয়া থাকে; জড় অন্তঃকরণ হইতে পারে না। অগ্নিসংযোগে লৌহে যেমন দাহিকাশক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবাত্মার সন্নিধানে

জড় অন্তঃকরণে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জীব নির্গুণ ও চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অন্যের সাহায্যে কর্তা ও ভোক্তা হইয়া থাকে, স্বয়ং কর্তা ও ভোক্তা হইতে পারে না।”[101]

“জীবাত্মা চেতন হওয়ায় তার সান্নিধাস্থিত অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞান সাপেক্ষ, জীব একদেশী, পরতঃ প্রকাশ ও অল্প সামর্থ্য বিশিষ্ট হওয়ায় সৃষ্টিকর্তা হইতে পারে না। জীবাত্মা যাহাদের সাহায্যে কার্য করিবে, সেই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার এমনকি স্থুল শরীর গঠন করার সামর্থ্য তাহার নেই। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর লাভ করিয়াও এই সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম ভূত, সূর্য্য, বায়ু, সমুদ্র, পর্বত, পৃথিবী ও পৃথিবীর গর্ভস্থ সুবর্ণাদি সৃষ্টি করা ত দূরের কথা ইহাদের সমন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও যোগজ সামর্থ্যের প্রয়োজন। জীব নির্গুণ, চৈতন্য স্বরূপ ও সহোজা অর্থাৎ, অপরের সাহায্যে তাহার প্রকাশ ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধির সাহায্যে আদি গুরু পরমাত্মা হইকে ক্রম পূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া সামর্থ্য অনুযায়ী স্থুল ভূতের উপর কিয়ৎ পরিমাণে কর্তৃত্ত্ব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।”[102]

সর্বদা কর্তার সাথেই কর্মের সম্বন্ধ হয় ও ক্রিয়াও সর্বদা কর্তার উপরেই প্রযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ—আপনি কাউকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করলেন। এখানে হত্যার জন্য দায়ী আপনি, কারণ তলোয়ার জড় পদার্থ। তলোয়ার কাউকে হত্যা করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে চালনা করে। আর হত্যার সম্বন্ধও হন্তারকের উপরেই প্রযুক্ত হয়, অস্ত্রের উপরে নয়। অর্থাৎ হত্যাকারী হিসেবে আপনার নামই প্রযুক্ত হবে, কারণ আপনি কর্তা। কেউই বলবে না যে তলোয়ার অমুককে হত্যা করেছে।

সেরূপ জগৎ সৃষ্টিকর্মের কর্তা হলেন ঈশ্বর। তাই ঈশ্বরের প্রাধান্য ও জগৎ সৃষ্টি বিষয়ক সম্বন্ধ সর্বদা ঈশ্বরের জন্য প্রযোজ্য।

---

101 অন্তঃকরণস্য তদুজ্জলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্।

—সাংখ্য দর্শন ১।৯৯

102 বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাম্।—সাংখ্য দর্শন ১।৯৭

বুঝলাম। কিন্তু ঈশ্বরের জগৎ নির্মাণের প্রয়োজন কী? আর ঐরূপ না মানলে ক্ষতিই বা কী?

ত্রৈতবাদ অনুযায়ী আমরা এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা পাই যা যোগ দর্শনে[103] পতঞ্জলি মুনি করে গেছেন।

যে কোন কাজের তিনটি কারণ থাকে। নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, সাধারণ কারণ। নিমিত্ত কারণ হল কর্তা, উপাদান কারণ কর্ম ও সাধারণ কারণ হল কার জন্য?

সহজভাবে বোঝালে, যদি একটা বাড়ির নির্মাণকে কার্য ধরি,—মিস্ত্রি সেই বাড়ির নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ ইট, বালু, সিমেন্ট, রড আর সাধারণ কারণ সেই বাড়িতে যারা থাকবে তারা।

ত্রৈতবাদ মতে সাধারণ কারণ হল জীবাত্মা। কেননা ঈশ্বর নিজে এই জগতকে কখনোই ভোগ করেন না। কাজেই এই জগতের সৃষ্টি জীবাত্মার ভোগের নিমিত্ত। অর্থাৎ জীবের বন্ধন ও মোক্ষসিদ্ধির জন্য জগৎ নির্মাণের প্রয়োজন আছে।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন—“সৃষ্টির সুখ-দুঃখ তুলনা করলে সুখ বহুগুণে অধিক হবে এবং বহু পবিত্রাত্মা জীবও মুক্তিসাধন করে মোক্ষানন্দ ভোগ করেন। জীব প্রলয়কালে কর্মহীনের ন্যায় সুষুপ্তিতে পড়ে থাকে। ঈশ্বর প্রলয়ের পূর্ব সৃষ্টিতে পাপপুণ্যের ফল জীবগণকে কিরূপে দিতে পারতেন? জীবগণই বা কিরূপে কর্মফল ভোগ করতে পারত? যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, চক্ষুর প্রয়োজন কি? তুমি বলবে ‘দর্শন’। তাহলে সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বরে সৃষ্টিবিজ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তুমি উত্তরে অন্য কিছুই বলতে পারবে না। আর জগৎ সৃষ্টি দ্বারাই পরমেশ্বরের ন্যায়শীলতা, ধারণ এবং দয়া প্রভৃতি গুণ সার্থক হতে পারে। তাঁর অনন্ত সামর্থ্য জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যবস্থা দ্বারাই স্বার্থক হয়ে থাকে। যেরূপ নেত্রের স্বাভাবিক গুণ দর্শন, সেরূপ জগৎ সৃষ্টি করে সমস্ত জীবকে অসংখ্য পদার্থ প্রদান পূর্বক পরোপকার করা ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ।”[104]

---

103 তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭

104 সত্যার্থ প্রকাশ, অষ্টম সমুল্লাস।

উপসংহার

এতক্ষণে আমরা জেনেছি ত্রৈতবাদ কি! আমরা মোটামুটি বিস্তারিতই জেনেছি, কিন্তু পাঠক! আপনার মনোমধ্যে কি কখনও এই প্রশ্নটি এসেছে যে,—সংক্ষেপে ত্রৈতবাদ বলতে কী বোঝায় বা ত্রৈতবাদ কাকে বলে?

সংক্ষেপে সত্তাত্রয়ের (ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি) ধারণাই ত্রৈতবাদ। এই সত্তাত্রয় অনাদি এবং সৃষ্টিও এই তিনের সম্মিলনেই হয়। জড় প্রকৃতি সর্বদাই চেতন জীবগণের ভোগ্য সম্পাদনে নিযুক্তা, আর ঈশ্বর নিমিত্তরূপে কর্তা। সেই প্রকৃতির দুই অবস্থা।

(১) কারণরূপ প্রকৃতি বা প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থা—সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাত্মক মৌল সমূহের পরমাণু। (জগদুৎপত্তির পূর্বে ও প্রলয়ের পর, প্রকৃতি এই অবস্থায় থাকে)।

(২) কার্যরূপ প্রকৃতি বা প্রকৃতির স্থূলাবস্থা—প্রকৃতির ঐ পরমাণু সমূহের সংযোগে গঠিত এই জগৎ। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতিরই বিকার। (জগদুৎপত্তির সময় থেকে প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতি এইরূপেই বিদ্যমান থাকে)।

অর্থাৎ কোনকালেই প্রকৃতির সৃষ্টি, বিনাশ বা লয় হয় না। শুধুমাত্র রূপের বা অবস্থার পরিবর্তন হয়। সেজন্যই প্রকৃতি অনাদি অর্থাৎ অজন্মা, উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত। জীবের জড় দেহও এই অনাদি প্রকৃতির পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) দ্বারাই নির্মিত হয়।

সুতরাং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই তিন সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। বিবর্তিত প্রকৃতি চক্ষুগোচর, অপর দুই সত্তা চক্ষুর অগোচর। আপনি যা দেখছেন, সবই প্রকৃতির বিবর্তিত রূপ। যার মাধ্যমে বলছেন 'আমি',—সেই আমিই হৃদাকাশের জীবাত্মা। এদ্ব্যতীত যে এক সত্তা, তিনি আপনার ভিতরেও আছেন, বাহিরেও সমানভাবে আছেন। তাঁকে খোঁজার জন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই, অন্তরেই খোঁজ করুন, অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হলে সেই জ্যোতির্ময় প্রভু আপনার অন্তরেই প্রকাশিত হবেন।

সমাপ্ত

গ্রন্থঋণ

১। ভারতীয় দর্শন —রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
২। ভারতীয় দর্শন —অর্জুনবিকাশ চৌধুরী
৩। ভারতীয় দর্শন—রণদীপম বসু
৪। ধর্মদর্শন—প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
৫। সাংখ্যসার—মহেশচন্দ্র পাল
৬। শ্রীগীতা—জগদীশচন্দ্র ঘোষ
৭। সাংখ্য দর্শন—স্বাধ্যায় প্রকাশনী
৮। যোগদর্শন—আচার্য কপিল আর্য
৯। ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা—মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
১০। গীতারহস্য—বাল-গঙ্গাধর তিলক
১১। বৈদিক প্রশ্নোত্তর—সঞ্জীব নেওয়ার
১২। সত্যার্থ প্রকাশ—মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
১৩। ব্রহ্মসূত্র—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
১৪। উপনিষদ (অখণ্ড)—হরফ প্রকাশনী
১৫। উপনিষদের দর্শন—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। বেদসার—স্বাধ্যায় প্রকাশনী
১৭। ব্রহ্মজ্ঞান, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী
১৮। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী—শ্রীপূর্ণ চন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু
১৯। সর্বদর্শন সংগ্রহ—শ্রীমহেশচন্দ্র পাল
২০। বাংলাদেশ অগ্নিবীরের বিভিন্ন আর্টিকেল

একটি বৃক্ষ দুইটি পক্ষী, একজন ভোক্তা অপরজন দ্রষ্টা।
অর্থাৎ মানুষের দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী সর্বদা বিদ্যমান।
পক্ষীদ্বয়ের মধ্যে জীবাত্মা নামরূপী একজন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি-সৃষ্ট
শরীরকে ভোগ করেন এবং পরমাত্মা নামরূপী অপরজন কেবল
দর্শন করেন, –স্বাক্ষীস্বরূপ।